ছোটদের কঙ্কাবতী

৺ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের
মূল গ্রন্থ হইতে
শ্রীঅনাথনাথ বসু কর্তৃক
সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাব্লিশিং কোং লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯
১৩৫৭

প্রকাশক :
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাব্লিশিং কোং লিঃ
৮-সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ চৈত্র, ১৩৫৭
দাম একটাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান সুপ্রিয়কে
উপহার দেওয়া হইল

ভূমিকা

৺ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অমর রসরচনা কঙ্কাবতী সংক্ষিপ্ত আকারে বাঙলাদেশের ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার জন্য ভূমিকার প্রয়োজন নাই। শুধু যাঁহাদের সাহায্য না পাইলে বইটি প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না এই সুযোগে তাঁহাদের নিকট 'আমার ঋণ স্বীকার করি। সর্বাগ্রে ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থগুলির বর্তমান সত্ত্বাধিকারিগণকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তখন নানা কারণে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাব্লিশিং কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ উৎসাহ করিয়া উহা প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাবদ্ধ করিয়াছেন।

যত দূর সম্ভব মূল গ্রন্থের ভাব ও গল্পাংশ অবিকৃত রাখিয়া বইটি যাহাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছি। এখন ইহা তাহাদের চিত্ত বিনোদন করিলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

দিল্লী
১৫ আগস্ট, ১৯৫০

অনাথনাথ বসু

ছোটদের কঙ্কাবতী

প্রথম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

অতি পুরানো কথা। কঙ্কাবতীর কথা অনেকেই জানে। ছেলেবেলায় কঙ্কাবতীর কথা অনেকেই শুনিয়াছে।

মনে পড়ে সুয়োরানী দুয়োরানীর কথা।
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর কথা॥
সেই সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান।
বৃষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর নদী এলো বান॥

সেই কঙ্কাবতীর কথা বলি শোন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুসুমঘাটী

গ্রামের নাম কুসুমঘাটী। বেশ বড় গ্রাম, অনেক লোকের বাস। গ্রামের পাশে মাঠ। এককালে সেই মাঠে ডাকাতেরা মানুষ মারিত। লোকে বলিত তাহারা মরিয়া ভূত হইত, আর বট, অশ্বত্থ, বেল প্রভৃতি গাছে বাস করিত। গ্রামের

পাশ দিয়া একটি নদী বহিয়া গিয়াছে। তাহাতে নাকি শিকল-হাতে "জটে বুড়ি" আছে, "জীবন্ত পাথর" আছে। "জীবন্ত পাথর" সুবিধা পাইলেই মানুষের বুকে চাপিয়া বসে। কুসুমঘাটীর কিছু দূরেই পাহাড়। পাহাড় ঘন বনে ঢাকা। সেই বনে বাঘভালুক থাকে। বাঘে লোকের গরুবাছুর লইয়া যায়। মাঝে মাঝে এক একটা বাঘ মানুষ খাইতে শেখে। তখন সে মানুষ ছাড়া আর কিছু খায় না। লোকে তাহার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া তাহাকে মারে। এক একটা বাঘ কিন্তু এমনি চালাক যে কেহ তাহাকে মারিতে পারে না। লোকে বলে সে সত্যিকারের বাঘ নয়, সে মানুষ। বনে একরকম শিকড় আছে, তাহা মাথায় পরিলে মানুষ তখনই বাঘের রূপ ধরিতে পারে। কাহারও সঙ্গে ঝগড়া থাকিলে লোকে সেই শিকড়টি মাথায় পরিয়া বাঘ হয়, বাঘ হইয়া শত্রুকে মারে। তাহার পর আবার শিকড় খুলিয়া মানুষ হয়। কেহ কেহ শিকড় খুলিয়া ফেলিতে পারে না, সে চিরদিনই বাঘ থাকিয়া যায়। এই বাঘ ভারী দুষ্ট হয়।

কুসুমঘাটীর লোকের মনে এইভাবের নানা রকমের বিশ্বাস আর ভয় আছে। কিন্তু আজকাল সকলের মন হইতে এইসব ভয় ক্রমে দূর হইতেছে। আজকাল আর লোকে ভূতপ্রেত মানে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তনু রায়

শ্রীযুক্ত রামতনু রায় মহাশয়ের বাস কুসুমঘাটী। সকলে তাঁহাকে তনু রায় বলিয়াই ডাকে। ইনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ। বয়স হইয়াছে, ব্রাহ্মণের আচারবিচার ক্রিয়াকর্মে তাঁহার খুব বিশ্বাস; লোককে দেখাইয়া সন্ধ্যাহ্নিক, জপতপ, শ্রাদ্ধতর্পণ আদি করেন। লোকে তাই তাঁহাকে খুব ভক্তি করে।

যখনকার কথা বলিতেছি তখন ব্রাহ্মণদের কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে মেয়ের বিবাহ দিবার সময় টাকা লইবার রীতি ছিল। তনু রায় এই রীতি খুব মানিতেন; তাঁহার তিনটি কন্যা আর একটি পুত্র ছিল। কন্যা দুইটির বিবাহ দিয়া তিনি টাকা লইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, বেশী বয়সের বরের সঙ্গে বিবাহ দেওয়াতে মোটা টাকাই লইয়াছিলেন। কোন মেয়েই বেশী বয়সের বুড়া বর পছন্দ করে না। কিন্তু তনু রায় মেয়ের কথা না ভাবিয়া টাকার লোভে দুই বুড়া জামাই করিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই জামাই মরিয়া গেল, মেয়ে দুইটি বিধবা হইল। কিন্তু তাহাতে তনু রায়ের দুঃখ নাই। তনু রায়ের ছেলেও বাবার মত হইয়াছে।

তনু রায়ের স্ত্রী কিন্তু অন্য প্রকৃতির মানুষ। বড় দুইটি মেয়ের বিবাহে তিনি খুব কান্নাকাটি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী তো মানিবার পাত্র নন। মেয়েরা বিধবা হইলে

তাঁহার বুক চোখের জলে ভাসিয়া গেল। প্রতিদিন পূজা করিয়া তিনি ঠাকুর-দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেন, "হে মা কালি, হে মা দুর্গা, হে ঠাকুর, যেন আমার কঙ্কাবতীর বরটি মনের মত হয়।"

কঙ্কাবতী তনু রায়ের ছোট মেয়ে, এখনও নিতান্ত শিশু।

তনু রায়ের সঙ্গে নিরঞ্জন কবিরত্নের ভাব নাই। নিরঞ্জন তনুরায়ের প্রতিবেশী; নিরঞ্জন বলেন, "রায়মশায়, কন্যার বিবাহ দিয়া টাকা লইবেন না, টাকা লইলে বড় পাপ হয়।" তনু রায় তাই নিরঞ্জনকে দেখিতে পারেন না।

নিরঞ্জন যেমন ভাল লোক তেমনই পণ্ডিত। অধ্যয়ন অধ্যাপন আর শাস্ত্রচর্চা লইয়াই তাঁহার দিন কাটে। এক-কালে তাঁহার টোলে অনেক ছাত্র ছিল; তিনি তাহাদের খাইতে পরিতে দিতেন, লেখাপড়া শিখাইতেন। তখন তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল। একবার গ্রামের জমিদার জনার্দন চৌধুরী তাঁহার ব্রহ্মোত্তর জমির উপর লোভ করিয়াছিল, তাই তিনি সে জমি তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহার অবস্থা খারাপ হইল। নিরঞ্জনের তাহাতে কোন দুঃখ নাই। তিনি খাঁটি লোক; অন্যায়ের কাছে মাথা নীচু করিবার, খোসামোদ করিবার অথবা অপমান সহ্য করিবার লোক নহেন। অবস্থা খারাপ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ছাত্রেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া গোবর্ধন শিরোমণির টোলে চলিয়া গেল। গোবর্ধন শিরোমণি জনার্দন চৌধুরীর সভাপণ্ডিত; তিনি

নিরঞ্জনের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান। তিনি বড়লোকের মন জোগাইয়া কথা বলিতে জানেন। তাই তাঁহার উন্নতি হয়, আর নিরঞ্জনের দুঃখকষ্টে দিন কাটে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খেতু

তনু রায়ের পাড়ায় একটি দুঃখিনী ব্রাহ্মণী বাস করেন। লোকে তাঁকে খেতুর মা বলিয়া ডাকে। খেতুর মা আজ দুঃখিনী বটে কিন্তু এক সময়ে তাঁর অবস্থা ভাল ছিল। তাঁর স্বামী শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখাপড়া জানিতেন, কলিকাতায় কাজকর্ম করিতেন, ভাল রোজগার করিতেন। কিন্তু তিনি টাকাকড়ি রাখিতে জানিতেন না। পরের দুঃখে তিনি বড় কাতর হইতেন ও যথাসাধ্য পরের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি অনেক লোককে অন্ন দিতেন ও অনেক ছেলের লেখাপড়ার খরচ দিতেন। এমন লোকের হাতে পয়সা থাকে না। বেশী বয়সে তাঁর ছেলে হইয়াছিল; তার নাম রাখিয়াছিলেন ক্ষেত্র। তাই তাঁর স্ত্রীকে সকলে খেতুর মা বলিয়া ডাকে।

খেতুর যখন চার বৎসর বয়স তখন শিবচন্দ্র হঠাৎ মারা গেলেন। তিনি একটি পয়সাও রাখিয়া যান নাই; তাই তাঁর মৃত্যুতে খেতু ও খেতুর মাকে পথে দাঁড়াইতে হইল। শিবচন্দ্র

তো অনেক লোকের উপকার করিয়াছিলেন, বিপদের দিনে কিন্তু তাহারা কেহই আসিল না, এক রামহরি মুখোপাধ্যায়ই তাঁহাদের সহায় হইলেন। তিনি কলিকাতা হইতে দুঃখিনী বিধবাকে চালের দামটি পাঠাইয়া দিতেন, আর বেশী করিতে পারিতেন না; কিন্তু সেইটুকুই বা করে কে? খেতুর মা পৈতা কাটিয়া কোনও মতে দিন কাটাইতেন। দেশেও নিরঞ্জন কবিরত্ন ছাড়া আর কেউ তাঁহাদের সহায় ছিল না।

এইভাবে অতিকষ্টে তাঁহাদের দিন কাটে, খেতুও বড় হয়। সে বড় গুণী ছেলে, তাহার অনেক গুণ। সে মায়ের দুঃখ বোঝে, মায়ের কথা শোনে, ছোটবেলা হইতেই তার মায়ের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা। সে গাঁয়ের পাঠশালায় পড়ে। দুই বৎসরেই সে তালপাতা শেষ করিয়া কলাপাতা ধরিয়াছে। গুরুমহাশয় বলেন, খেতু সকলের চেয়ে ভাল ছেলে। সে এদিকে যেমন শান্ত সুবোধ, ওদিকে আবার তেমনি সাহসী।

খেতুর যখন সাত বৎসর বয়স তখন রামহরি দেশে আসিয়া খেতুকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কলিকাতায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। খেতুর মা প্রথমটা কিছুতেই মত দিবেন না; তিনি ছেলেকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না, ছেলে কলিকাতায় লেখাপড়া শিখিয়া বদ হইয়া যাইবে, এইরকম কথা বলিতে লাগিলেন। রামহরি তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন, "কোন ভয় নাই, লেখাপড়া শিখিলে সকলেই তো বদ হয় না।" খেতুকে তিনি নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন, নিজের ছেলের চেয়েও যত্ন করিবেন। তিনি নিয়মমত

তাঁহাকে খবর দিবেন ; আর, কিছুদিন পরে ছেলেই লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহাকে চিঠি দিবে, ছুটির সময়টা তাঁহার কাছে কাটাইয়া যাইবে। এইসব শুনিয়া অবশেষে খেতুর মা রাজী হইলেন। ঠিক হইল, আজ শুক্রবার, আর চারদিন পরে বুধবারে তিনি খেতুকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা যাত্রা

যেদিন রামহরির সঙ্গে কথাবার্তা হইল সেদিন রাত্রে খেতুর মা খেতুকে কলিকাতা যাইবার কথা বলিলেন। মা সঙ্গে যাইবেন না শুনিয়া খেতু প্রথমটা আপত্তি করিল। তখন মা তাকে বুঝাইলেন ; "তুমি এখন বড় হয়েছ, এখন তোমাকে লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে হবে ; তবেই আমাদের দুঃখ দূর হবে। তুমি মানুষ হয়ে রোজগার করবে, তখন আর আমাকে পৈতা কাটতে হবে না। আমি তখন সুখে স্বচ্ছন্দে থাকব, পূজা-আর্চা করব।"

খেতু বলিল, "মা, আমি গেলে তুমি কাঁদবে না তো ?" মা বলিলেন, "না বাছা কাঁদব না।" মা বলিলেন, "তুমি লেখাপড়া শিখবে, আমাকে চিঠি লিখবে, আর ছুটির সময় আমার কাছে আসবে।"

খেতু বলিল, "মা, কলকাতায় কি মালা পাওয়া যায়? তোমার জন্য মালা কিনে আনব; তুমি জপ করবে।"

এইভাবে মায়েপোয়ে অনেক কথা হইল।

তারপর কলিকাতা যাইবার আয়োজনের পালা আরম্ভ হইল। মা ছেলের ছেঁড়া কাপড়গুলি সেলাই করিয়া সেগুলি ক্ষারে কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন। খেতু নিরঞ্জন কাকার নিকট বিদায় লইয়া আসিল; নিরঞ্জন তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন, নানা ভাল কথা বলিলেন।

মঙ্গলবার রাত্রে মাতাপুত্রের আর ঘুম হইল না; দুইজনে কেবল কথা বলিতে লাগিলেন; কথা যেন আর ফুরায় না।

সকালবেলায় রামহরি আসিলেন। খেতুর মা খেতুর কপালে দইয়ের ফোঁটা দিলেন, চাদরের খুঁটে পূজার ফুল ও বেলপাতা বাঁধিয়া দিলেন। ছেলেকে বিদায় দিতে তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল, চোখে জল ধরিতেছিল না। কিন্তু পাছে চোখের জল পড়িলে অকল্যাণ হয় তাই চোখের জল চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। রামহরি ও খেতু তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ তিনি অনিমেষ চোখে তাহাদের পথের দিকে চাহিয়া থাকিলেন। খেতুও মাঝে মাঝে পিছনে ফিরিয়া মাকে দেখিতেছিল। যখন আর দেখা গেল না, তখন খেতুর মা পথে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার চোখের জলে পথের ধূলা ভিজিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কঙ্কাবতী

পথে পড়িয়া খেতুর মা কাঁদিতেছেন, এমন সময়ে তনু রায়ের স্ত্রী সেইখানে আসিলেন। তিনি খেতুর মার হাত ধরিয়া উঠাইয়া চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, তাঁহাকে ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া দুজনে খেতুর গল্প করিলেন। খেতুর মা খাইবেন না, তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন, না খাইলে খেতুর অকল্যাণ হইবে, এই বলিয়া তরকারি কুটিয়া বাটনা বাটিয়া দিলেন। তাঁহার কথায় খেতুর মা কতকটা শান্ত হইলেন। তাঁহাকে শান্ত করিয়া তনু রায়ের স্ত্রী নিজের বাড়ী গেলেন, বলিয়া গেলেন, ওবেলায় আবার আসিব।

বৈকালে তিনি আবার আসিলেন; তাঁহার সঙ্গে কোলের মেয়েটি ছিল। তাহাকে দেখিয়া খেতুর মার বড় ভাল লাগিল। মেয়েটি বড় সুন্দর, যেমন মুখ, তেমনি চুল, তেমনি রং।

দুইজনের অনেক সুখদুঃখের গল্প হইল।

খেতুর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটির কি নাম রেখেছ?" তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন, "কঙ্কাবতী"। খেতুর মা বলিলেন, "কঙ্কাবতী! দিব্যি নামটি তো, মেয়েটি যেমন নরম নামটিও তেমনই মিষ্টি।"

এইরকমে খেতুর মাতে ও তনু রায়ের স্ত্রীতে ক্রমে খুব ভাব হইল। অবসর পাইলেই তনু রায়ের স্ত্রী খেতুর মার

কাছে যান, খেতুর মাও তনু রায়ের স্ত্রীর কাছে যান। মাঝে মাঝে তনু রায়ের স্ত্রী কঙ্কাবতীকে খেতুর মার কাছে ছাড়িয়া যান।

মেয়েটি এখনও হাঁটিতে শেখে নাই, তার বয়স এখন সবে এক বৎসর পূরা হইয়াছে। সে হামাগুড়ি দেয়, নিজের মনে খেলা করে। খেতুর মা মাঝে মাঝে তাকে দুএকটি কথা বলেন; কথা বলিলে মেয়েটি গাল ভরিয়া হাসে। মেয়েটি বড় শান্ত, একেবারে কাঁদিতে জানে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খেতু ও কঙ্কাবতী

কলিকাতায় গিয়া খেতু ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। শান্ত, শিষ্ট, সুবুদ্ধি ছেলে, খেতুর নানা গুণ দেখিয়া সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। রামহরি ও রামহরির স্ত্রী খেতুকে নিজের ছেলের মত ভালবাসেন।

ইস্কুলে খেতুর বুদ্ধি দেখিয়া সকলেই অবাক হইল। সে সব বিষয়ে প্রথম। যখন যে শ্রেণীতে পড়ে তখন সে শ্রেণীর সবচেয়ে ভাল ছেলে খেতু; খেতুর উপরে কেহ উঠিতে পারে না। এইভাবে সে এক শ্রেণী হইতে আর এক শ্রেণীতে উঠিতে লাগিল।

জল খাইবার জন্য রামহরি খেতুকে একটি করিয়া পয়সা দিতেন ; খেতু বেশীর ভাগ দিনই জলখাবার না খাইয়া পয়সা জমাইত, মায়ের জন্য মালা কিনিয়া লইয়া যাইবে।

রামহরি হঠাৎ একদিন কথাটা জানিতে পারিলেন ; জানিতে পারিয়া তিনি খুশীই হইলেন, খেতুকে বকিলেন না। বলিলেন, তিনি মালা কিনিয়া দিবেন।

পূজার ছুটি আসিল। খেতু জমানো পয়সা তাঁহাকে আনিয়া দিল মালা কিনিবার জন্য। রামহরি গণিয়া দেখেন, একটাকা হইয়াছে। তিনি আট আনা দিয়া একটা ভাল মালা কিনিয়া দিলেন, আর বাকি আট আনা খেতুকে ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, 'মাকে দিও।'

বাড়ী যাইবার দিন নিকটে আসিল। গ্রামে লোক যাইতেছিল, রামহরি তাহাদের সঙ্গে খেতুকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। খেতুর মা খবর পাইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন ; দূর হইতে খেতুকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। ছেলেকে বুকে পাইয়া তিনি যেন স্বর্গসুখ পাইলেন। তিনি খেতুকে কোলে তুলিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন। কোলে যাইতে যাইতে খেতু পয়সাগুলি চুপি চুপি মার আঁচলে বাঁধিয়া দিল। বাড়ী যাইয়া যখন খেতু মার কোল হইতে নামিল তখন মার আঁচল ভারী ঠেকিল। মা বলিলেন, "এ আবার কি ? খেতু, তুমি বুঝি আঁচলে পয়সা বেঁধে দিলে ?"

খেতু হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "মা, রও, তোমাকে আরও

একটা তামাসা দেখাই।” এই বলিয়া মালাটি মার গলায় দিয়া দিল। বলিল, “কেমন মা, মনে আছে তো?” মায়ের মনে বড় সুখ হইল।

পরদিন খেতু দেখে যে তাহাদের বাড়ীতে কোথা হইতে একটি ছোট মেয়ে আসিয়াছে।

খেতু মাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মা, এ মেয়েটি কাদের গো?” মা কঙ্কাবতীর পরিচয় দিলেন।

খেতুর কঙ্কাবতীকে বড় ভাল লাগিল, বলিল, “এবার যখন আসব এর জন্য একটা পুতুল কিনে আনব।” মা শুনিয়া খুশী হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মেনী

পূজার ছুটি ফুরাইল; খেতু কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। সেখানে সে খুব মন দিয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। বৎসরের মধ্যে দুইবার ছুটি হয়। সেই সময়ে সে দেশে আসে। আসিবার সময় মার জন্য কোন না কোন জিনিস, আর কঙ্কাবতীর জন্য পুতুল বা খেলনা লইয়া আসে। কঙ্কাবতী প্রায়ই খেতুর মার কাছে থাকে, তিনি কঙ্কাবতীকে বড় ভালবাসেন।

খেতুর যখন বার বৎসর বয়স তখন সে এক বড়লোকের ছেলেকে পড়াইতে লাগিল। তিনি তাহাকে এইজন্য মাসে মাসে পাঁচ টাকা দিতেন। সে টাকা রামহরি তার মাকে পাঠাইয়া দিতেন। বার বছরের ছেলে এইভাবে মাকে প্রতিপালন করিতে লাগিল।

এবার যখন খেতু ছুটিতে বাড়ী আসিল তখন মায়ের জন্য একখানি নামাবলী, আর কঙ্কাবতীর জন্য একটা রাঙা কাপড় আনিল। দুজনেই খুব খুশী।

খেতুর ভারী ইচ্ছা কঙ্কাবতীকে লেখাপড়া শেখায়; মাকে সে কথা বলিল; মা তনু রায়ের স্ত্রীকে বলিলেন। তাঁর নিজের মত ছিল, কিন্তু স্বামীর মত দরকার; তাই তিনি স্বামীর কাছে কথাটা পাড়িলেন; খেতু যে কঙ্কাবতীর জন্য কাপড় আনিয়াছে সেটি দেখাইলেন। তনু রায় ভাবিয়া দেখিলেন মেয়ে লেখা-পড়া শিখিলে ভাল বই মন্দ হইবে না, আর তাঁহার তো খরচ নাই সুতরাং তিনি মত দিলেন; বলিলেন, "খেতু ছেলেটি ভাল, লেখাপড়ায় মন আছে। দুপয়সা এনে খেতে পারবে।"

এবার যখন খেতু বাড়ী আসিল কঙ্কাবতীর জন্য একটি প্রথম ভাগ কিনিয়া আনিল। লেখাপড়া শেখায় কঙ্কাবতীর প্রথমটা খুব উৎসাহ দেখা গেল। কিন্তু দুচারদিন পরেই সে দেখিল লেখাপড়া শেখা অত সহজ নয়। খেতু তাহাকে শিখাইতে যায়, সে সব ভুল করে। খেতুর রাগ হইল; সে

বলিল, "কঙ্কাবতী, তোমার লেখাপড়া হবে না, তুমি চিরকাল মূর্খ হয়ে থাকবে।"

অভিমানী কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিল। খেতুর মা বলিলেন, "ছেলেমানুষ, তাকে মিষ্টি কথায় শেখাইতে হয়, রাগ করলে কি চলে।"

খেতু বলিল, "কঙ্কাবতী রাতদিন মেনীকে নিয়ে থাকে; তাতে কি লেখাপড়া হয়?"

মেনী কঙ্কাবতীর পোষা বিড়াল, বড় আদরের ধন।

কঙ্কাবতী বলিল, "জেঠাই মা, আমি মেনীকে ক খ শেখাই। আমি যেমন বোকা, সেও তেমনি বোকা। শিখতে পারে না। আমরা তুজনেই তো ছেলেমানুষ; বড় হলে আমরা তুজনেই লেখাপড়া শিখব।"

কঙ্কাবতীর কথা শুনিয়া খেতু খুব হাসিল।

যাহা হোক্ ক্রমে কঙ্কাবতী প্রথম ভাগ পড়িতে শিখিল। ছুটির শেষে খেতু বলিল, "এবার আসবার সময় তোমার জন্য দ্বিতীয় ভাগ আনব। এই ক'মাস প্রথম ভাগটা বার বার পড়ে রেখো।"

দ্বিতীয় ভাগ আসিলে কঙ্কাবতী সেটিও পড়িয়া শেষ করিল। কঙ্কাবতীর পড়ায় মন বসিয়াছে, এখন আর তাহাকে পড়াইতে হয় না, নিজে নিজেই পড়ে ও শেখে। খেতু কঙ্কাবতীকে একটি পাটিগণিত দিয়াছে, তাহা হইতে সে অঙ্ক শিখিল। খেতু মাঝে মাঝে একটু আধটু বলিয়া দিত।

কঙ্কাবতী পড়িতে ভালবাসিত। খেতু তাহার জন্য কলিকাতা হইতে নানারকম বই ও খবরের কাগজ আনিয়া দিত। কঙ্কাবতী সেগুলি মন দিয়া পড়িয়া শেষ করিত, বিজ্ঞাপনগুলি পর্যন্ত পড়িয়া ফেলিত।

নবম পরিচ্ছেদ

সম্বন্ধ

তের বছর বয়সে খেতু ইংরেজীতে প্রথম পাসটি দিল; পাস করিয়া সে জলপানি পাইল। জলপানির টাকায় সে মার জন্য একটি ঝি রাখিয়া দিল। মা এখন বুড়া হইয়াছেন সব কাজ আর করিতে পারেন না।

পনর বছর বয়সে খেতু আর একটি পাস দিল, দিয়া আবার জলপানি পাইল। এবার জলপানি কিছু বেশী হইল। সতের বৎসর বয়সে সে আবার একটি পাস দিয়া জলপানি পাইল। এবার জলপানি আরও বেশী হইল।

খেতু জলপানির টাকা দিয়া মায়ের দুঃখ ঘুচাইল। মার আর কোন অভাব রহিল না। তিনি যখন যাহা চান তখনই তাহা পান। একদিন মা শিবপূজার ফুল পান নাই। তাই শুনিয়া খেতু মায়ের পূজার ফুলের জন্য বাড়ীতে ফুলের বাগান করিয়া দিল, কলিকাতা হইতে নানা রকমের গাছ

আনিয়া পুঁতিল। নানা রঙের ফুলে বাগানটি বারো মাস আলো হইয়া থাকিত।

বাড়ী আসিবার সময় খেতু মার জন্য কতরকম জিনিস আনিত। শুধু মার জন্যই নহে, গ্রামের যে সকল আত্মীয়স্বজন ছিল সকলেরই জন্য কিছু না কিছু আনিত। কঙ্কাবতীর জন্য বই কাগজপত্র আনিত; পাড়ার নিরঞ্জন কাকার জন্য কিছু আনিত। সকলেই খেতুকে ভালবাসিত, খেতুকে আশীর্বাদ করিত।

কঙ্কাবতী এখন বড় হইয়াছে। সে আর এখন খেতুর সামনে বড় বাহির হয় না; খেতুকে দেখিলে এখন তার লজ্জা হয়।

খেতু বড় হইয়াছে; কিন্তু রামহরি ও রামহরির স্ত্রী এখনও খেতুকে আগের চোখেই দেখিতেন, তাহাকে ছেলের মত ভালবাসিতেন।

খেতু তিনটা পাস দিল। তখন রামহরির কাছে নানা জায়গা হইতে তাহার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল; রামহরি বলিলেন খেতুর মার মত লইয়া তিনি ঠিক করিবেন।

এদিকে কঙ্কাবতীরও বিবাহের বয়স হইয়াছে। তাহার যেমন রূপ তেমনি গুণ। মা তাহা দেখিয়া তনু রায়কে বলিলেন, "এইবার কঙ্কাবতীর বিয়ে দিয়ে আমার একটি সাধ পূর্ণ কর।" তনু রায় এতদিন মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখেন নাই, এখন দেখেন সত্যই তো মেয়ে বড় হইয়াছে। এইবার তার বিবাহ দিতে হয়। তনু রায় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার সাধটা কি শুনি।" স্ত্রী বলিলেন, "আমার সাধ ঝি-জামাই নিয়ে আহ্লাদ করি। দুই মেয়ের বিয়ে তুমি দিলে; আমার সাধ মিটল না; সে যা হবার হয়েছে, এখন কঙ্কাবতীর একটা ভাল দেখে বিয়ে দাও, আমার সাধ পূর্ণ হোক্।"

স্ত্রী বল, পুত্র বল, কন্যা বল টাকার চেয়ে তনু রায়ের কাছে কেহ প্রিয় নয়। কিন্তু তবুও কঙ্কাবতী তাঁহার কোলের মেয়ে, তাহাকে তনু রায় বড় ভালবাসেন।

কিছুক্ষণ ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি না হয় কঙ্কাবতীর বিয়ে দিয়ে টাকা না নিলাম; কিন্তু তাই বলে ঘর থেকে তো টাকা দিতে পারব না, আর টাকা না দিলে ভাল পাত্র মিলবে না। তার কি করব?"

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন, "আচ্ছা আমি যদি বিনা টাকায় ভাল পাত্রের সন্ধান দিতে পারি, তুমি তার সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিয়ে দেবে কিনা বল?"

তখন তিনি খেতুর কথা বলিলেন। তনু রায় প্রথমটা একটু আপত্তি করিয়া পরে বলিলেন, "আচ্ছা, তাড়াতাড়ি নাই, দেখা যাক্।"

এদিকে রামহরি খেতুর মাকে খেতুর সম্বন্ধের কথা লিখিলেন। কোন্ এক বড়লোক অনেক টাকাকড়ি দিয়া খেতুর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিবাহের কথা পাড়িয়াছেন, সেখানে বিবাহ দেওয়া হইবে কিনা তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। খেতুর মা সে চিঠি তনু রায়ের কাছে পড়াইতে আনিয়াছিলেন। তিনি তো পড়িয়াই অবাক্।

এদিকে খেতুর অন্য জায়গায় বিবাহ হইবে একথা শুনিয়া অবধি কঙ্কাবতীর মা স্বামীর কাছে কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। তনু রায় অনেক ভাবিয়া দেখিলেন খেতুর মত এমন পাত্র তিনি আর পাইবেন না। ছেলেটা মূর্খ, তিনি বুড়া হইয়াছেন, ঘরে দুটা বিধবা মেয়ে, এমন অবস্থায় সংসারের একজন অভিভাবক দরকার। খেতুর এদিকে যেমন গুণ ওদিকে সে তাহাদের অভিভাবকও হইতে পারিবে। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কঙ্কাবতীর মাকে বলিলেন, "তুমি যদি খেতুর সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিবাহ স্থির করতে পার তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি খরচপত্র কিছু করতে পারব না।"

স্বামীর অনুমতি পাইয়া কঙ্কাবতীর মা খেতুর মার কাছে দৌড়াইয়া গেলেন, আর তাঁহার কাছে সব কথা খুলিয়া বলিলেন।

খেতুর মা বলিলেন, "কঙ্কাবতী আমার বৌ হবে এ আমার চিরকালের সাধ। ভালই হল। রামহরিকে খবরটা দিই।"

পরদিনই কলিকাতায় চিঠি পাঠান হইল।

রামহরি খেতুকে চিঠি দিলেন। খেতু বলিল, "মার যা ইচ্ছা তাই হবে। তবে তাড়াতাড়ি কিছু নাই। দুই তিন বৎসর যাক্। ততদিনে আমারও লেখাপড়া শেষ হবে, কিছু রোজগারও করতে পারব। আপনি এই কথা জানান।"

রামহরি সেই কথা লিখিলেন। তনু রায় রাজি হইলেন।

খেতুর সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিবাহ হইবে একথা শুনিয়া সকলেই খুশী হইল, আর কঙ্কাবতীর আনন্দের অবধি রহিল না।

দশম পরিচ্ছেদ

কঙ্কাবতীর দুঃখ

দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। খেতুর বয়স এখন কুড়ি বৎসর। যাহা কিছু পাশ ছিল সে সবগুলি দিয়াছে; আরও দুএকটি পরীক্ষাও দিয়াছে। কথা হইয়াছে সে ভাল একটা চাকরী পাইবে।

এখন খেতুর বিবাহ দিতে হয়। রামহরি খেতুর মাকে সেকথা লিখিলেন।

এদিকে গ্রামে অনেক ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। জমিদার জনার্দন চৌধুরীর স্ত্রী মারা গিয়াছে। সে আবার বিবাহ করিবে ঠিক করিয়াছে। তাহার বয়স এখন আশির কাছাকাছি। ছেলেপিলে, নাতিনাতনিতে ঘর ভর্তি। এ বয়সে কে তাহার সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিবে? কিন্তু জনার্দন চৌধুরীর অনেক টাকা অনেক বিষয়সম্পত্তি। তাহার টাকার লোভে তনু রায় ঠিক করিলেন তাহারই সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবেন।

প্রথমটা তাঁহারও মনে একটু ইতস্তত ভাব হইয়াছিল। কিন্তু যখন চৌধুরী লোভ দেখাইল মেয়েকে দশ হাজার টাকা দিবে আর একটা তালুক দিবে, আর কন্যার বাবাকে দুই হাজার টাকা দিবে, তখন তিনি আর লোভ সামলাইতে পারিলেন না। তিনি যে আগে কথা দিয়াছেন, কথা না রাখা যে অন্যায় সেসব কথা আর তাঁর মনেই হইল না। তিনি চৌধুরীর সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিবাহে রাজী হইলেন।

একথা যে শুনিল সে-ই ছি ছি করিতে লাগিল। তনু রায়ের স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যা লইলেন। কিন্তু কাহারও চোখের জলে তনু রায় টলিবার পাত্র নন। পাড়ার লোকে তাঁহাকে বুঝাইতে গেল, তিনি তাহাদের তাড়াইয়া দিলেন। এমন কি খেতুও আসিয়া তাঁহাকে বলিল, আমার সঙ্গে বিয়ে দিন না দিন, অন্য ভাল পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিন। এসব কথায় তনু রায় বোঝা দূরে থাক আরও রাগ করিলেন। খেতু জনার্দন চৌধুরীকে বলিতে গেল। জনার্দন বিবাহের জন্য পাগল। তিনি কেন খেতুর কথা শুনিবেন ? উল্টা তিনি খেতুর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাহাকে একঘরে করিবার ব্যবস্থা করিলেন। খেতুর নামে অপবাদ সে কলিকাতায় থাকিতে বরফ খাইয়াছে। বরফ সাহেবদের কলে তৈয়ারী, সুতরাং তাহাদের ছোঁয়া ; তাহাদের ছোঁয়া খাইলে জাত যায়, অতএব খেতুর জাত গিয়াছে ; অতএব তাহাকে একঘরে করিতে হইবে ; তাহার সঙ্গে কোন সংশ্রব রাখা চলিবে না।

চৌধুরীর এই ষড়যন্ত্রে অনেকেই যোগ দিল, দিলেন না শুধু নিরঞ্জন। তখন তাঁহার আর খেতুর উপর নানা অত্যাচার হইতে লাগিল। নিরঞ্জন শেষে গ্রাম ছাড়িয়া গেলেন। খেতু আর খেতুর মাও দেশ ছাড়িয়া যাওয়া স্থির করিলেন। ঠিক হইল আর সাত দিন পরে কঙ্কাবতীর বিবাহ হইবে ; সেইদিন তাঁহারা দেশ ছাড়িয়া যাইবেন।

খেতুর মা বলিলেন, "দাসেদের মেয়ের কাছে শুনলাম কঙ্কাবতীকে আর চেনা যায় না, সে রূপ নেই, সে রং নেই,

মুখে সে হাসি নেই। আহা, তবুও বাছা মার দুঃখে কাতর! মা রাত্রিদিন কাঁদছে। নিজের দুঃখ ভুলে সে মাকে বোঝাচ্ছে।"

মায়েপোয়ে এইরকম কথা হয়।

পরদিন খেতুর মা বলিলেন, "আজ শুনলাম কঙ্কাবতীর বড় জ্বর হয়েছে, প্রলাপ বকছে; মেয়েটা বুঝি বাঁচে না।"

এইরূপে দিন দিন কঙ্কাবতীর অসুখ বাড়িতেই লাগিল। জনার্দন চৌধুরী কবিরাজ পাঠাইলেন; কবিরাজ কত চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অসুখ কমিল না। এদিকে তাহার বিবাহের দিন উপস্থিত হইল।

সেদিন কঙ্কাবতীর গায়ের বড় জ্বালা, তাহার বড় পিপাসা। কঙ্কাবতীর আর জ্ঞান নাই, জ্বরের ঘোরে সে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। কঙ্কাবতী এখন যায় তখন যায় এমন তাহার অবস্থা।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

নৌকা

বড় পিপাসা, বড় গায়ের জ্বালা!

কঙ্কাবতী মনে ভাবিল, যাই, নদীর ঘাটে যাই, সেখানে বসিয়া পেট ভরিয়া জল খাই, আর গায়ে জল দিই। তাহা হইলে বুঝি জ্বালা মিটিবে।

নদীর ঘাটে বসিয়া কঙ্কাবতী জল মাখিতেছে, এমন সময়ে কে বলিল,—"কেও, কঙ্কাবতী?" কঙ্কাবতী চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কে তাহাকে ডাকিল তাহা ঠিক করিতে পারিল না। নদীর জলে দূরে কেবল একটা কাতলা মাছ ভাসিতেছে আর ডুবিতেছে তাহাই দেখিতে পাইল।

আবার কে জিজ্ঞাসা করিল, "কেও, কঙ্কাবতী?" কঙ্কাবতী এবার উত্তর দিল, "হাঁ গো আমি কঙ্কাবতী।"

আবার কে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি বড় পিপাসা, বড় গায়ের জ্বালা?"

কঙ্কাবতী উত্তর দিল, "হাঁ গো আমার বড় পিপাসা, বড় গায়ের জ্বালা!"

তখন কে বলিল, "তবে এক কাজ কর ; নদীর মাঝখানে চল। নদীর ভিতর খুব ঠাণ্ডা ঘর আছে ; সেখানে গেলে তোমার পিপাসা দূর হবে, শরীর জুড়িয়ে যাবে।"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "নদীর মাঝখান যে অনেক দূর ! সেখানে আমি কেমন করে যাই ?"

কে যেন উত্তর দিল, "ওই যে জেলেদের নৌকা আছে, ঐ নৌকায় চড়ে চলে যাও।"

কঙ্কাবতী জেলেদের নৌকায় গিয়া বসিল। নৌকা নদীর মাঝখানে যাইতে লাগিল।

এদিকে বাড়ীতে খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গিয়াছে। কঙ্কাবতী কোথায় গেল ? কে যেন বলিল সে নদীর ঘাটে গিয়াছে। তখন সকলে ছুটিয়া নদীর ঘাটে গেল। ঘাটে আসিয়া দেখে কঙ্কাবতী একখানি নৌকার উপর চড়িয়া নদীর মাঝখানে যাইতেছে।

কঙ্কাবতীর বড় বোন প্রথমে ডাকিল—

"কঙ্কাবতী বোন আমার, ঘরে ফিরে এস না,
বড় দিদি হই আমি, ভাল কি আর বাস না ?
তিনটি বোন আছি দিদি, বিধবা ছুটি তার।
কঙ্কাবতী ছোট তুমি, বড় আদরের মার।"

নৌকা হইতে কঙ্কাবতী উত্তর দিল—

"শুনিয়াছি আছে নাকি জলের ভিতর,
শান্তিময় সুখময় সুশীতল ঘর।

সেইখানে যাই দিদি, পূজি তোমার পা।
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি হুথু যা।”

এই কথা বলিতেই নৌকা আরও গভীর জলে ভাসিয়া গেল।

তখন ভাই আসিয়া কঙ্কাবতীকে বলিল—

“কঙ্কাবতী ঘরে এস, কুলেতে দিও না কালি,
রেগেছেন বাবা বড় দিবেন কতই গালি।
বালিকা অবুঝ তুমি, কি জান সংসার-কথা,
ঘরে ফিরে এস, দিও না বাপের মনে ব্যথা।”

কঙ্কাবতী উত্তর দিল—

“কি বলিছ দাদা তুমি বুঝিতে না পারি,
জ্বলিছে আগুন দেহে নিভাইতে নারি।
যাও দাদা ঘরে যাও হও তুমি রাজা।
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি হুথু যা।”

এই কথা বলিতেই নৌকা আরও দূর জলে ভাসিয়া গেল।

তখন মা আসিয়া ডাকিলেন—

“কঙ্কাবতী লক্ষ্মী আমার, ঘরে ফিরে এস না।
কাঁদিতেছে মায়ের প্রাণ, বিলম্ব আর কোরো না।
ভাত হইল কড়কড় ব্যঞ্জন হইল বাসি।
কঙ্কাবতী মা আমার সাত দিন উপবাসী।”

কঙ্কাবতী উত্তর দিল—

"বড়ই পিপাসা মাগো না পারি সহিতে।
তুষের আগুন সদা জ্বলিছে দেহেতে।
এই আগুন নিভাইতে যাইতেছি মা।
কঙ্কাবতীর নৌকাখানি এই হুথ্ যা।"

এই বলিতে নৌকা আরও দূর জলে ভাসিয়া গেল। তখন বাপ আসিয়া ডাকিলেন—

"কঙ্কাবতী ঘরে এস, হইবে তোমার বিয়া।
কত যে হতেছে ঘটা দেখ তুমি ঘরে গিয়া।
গহনা পরিবে কত আর সাটিনের জামা।
কত যে পাইবে টাকা নাহিক তার সীমা॥"

কঙ্কাবতী উত্তর দিল—

"টাকা কড়ি কাজ নাই বসন ভূষণ,
আগুনে পুড়িছে পিতা শরীর এখন।
দারুণ যাতনা পিতা আর তো সহে না।
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি ডুবে যা।"

এই বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি মাঝনদীর জলে টুপ্ করিয়া ডুবিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জলে

নৌকার সঙ্গে কঙ্কাবতীও ডুবিয়া গেল। ডুবিতে ডুবিতে কঙ্কাবতী জলের ভিতরে অনেক দূরে চলিয়া গেল। তখন নদীর যত মাছ সব একত্র হইল। নদীর ভিতর মহা কোলাহল পড়িয়া গেল যে কঙ্কাবতী আসিতেছে। রুই বলে, কঙ্কাবতী আসিতেছে, পুঁটি বলে, কঙ্কাবতী আসিতেছে। এমন সময়ে সেখানে কঙ্কাবতী আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই তাহাকে আদর করিয়া নিল। সকলেই বলিল, "এস, এস, কঙ্কাবতী এস।"

মাছেদের ছেলেমেয়েরা বলিল, "আমরা কঙ্কাবতীর সঙ্গে খেলা করব।"

বুড়ী কাতলামাছ তাহাদের ধমক দিয়া বলিল, "কঙ্কাবতীর এ খেলা করিবার সময় নয় বাছার বড় গায়ের জ্বালা দেখে কঙ্কাবতীকে আমি ঘাট হতে ডেকে এনেছি। এস মা! তুমি আমার কাছে এস। একটু বিশ্রাম কর, তার পর তোমার একটা বিলি করা যাবে।"

কঙ্কাবতী গিয়া আস্তে আস্তে কাতলামাছের কাছে গিয়া বসিল।

এদিকে কঙ্কাবতী বিশ্রাম করিতেছে, ওদিকে জলের যত জীবজন্তু সকলে মিলিয়া মহা সমারোহে একটা সভা করিল। তপসী মাছের দাড়ি আছে দেখিয়া সকলেই তাহাকে সভাপতি করিল। "কঙ্কাবতীকে লইয়া কি করা যায়"

সভায় এই কথা লইয়া বক্তৃতা ও তর্ক হইতে লাগিল। অনেক বক্তৃতার পর বুদ্ধিমান বাটামাছ প্রস্তাব করিল, "এস আমরা কঙ্কাবতীকে রানী করি।"

কথাটা সকলেরই ভাল লাগিল, সকলেই প্রস্তাবে রাজী হইল। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল।

মাছেদের আজ বড় আনন্দ। আজ হইতে কঙ্কাবতী তাহাদের রানী হইবে। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল কঙ্কাবতী রানী হলে আমাদের আর কোন ভাবনা থাকবে না। বঁড়শি দিয়ে কেউ আমাদের গাঁথলে কঙ্কাবতী সূতাটি ছিঁড়ে দেবে। জেলেরা জাল ফেললে ছুরি দিয়ে কঙ্কাবতী জালটি কেটে দেবে। কঙ্কাবতী রানী হলে আমাদের আর কোন ভয় থাকবে না।

মাছেরা কঙ্কাবতীকে গিয়া বলিল, "কঙ্কাবতী, তোমাকে আমাদের রানী হতে হবে।"

কঙ্কাবতী বলিল, "আমার মনে সুখ নেই। আমি এখন তোমাদের রানী হতে পারব না।"

বুড়ী কাতলানী বলিল, "রানী যে হবে তো রাজপোষাক কই ? পোষাক না হলে কঙ্কাবতী রানী হবে না।"

মাছেরা বলিল, "তাই তো, ঠিক কথা।"

কঙ্কাবতী বলিল, "না গো, রাজপোষাকের জন্য নয়, আমার মনে বড় ব্যথা। রানী হতে আমার সাধ নেই।"

মাছেরা সেকথা শুনিল না। বড় গোলমাল করিতে লাগিল। অগত্যা কঙ্কাবতীকে বলিতে হইল, "ভাল, না হয়

আমি তোমাদের রানী হলাম। এখন আমাকে করতে হবে কি?”

মাছেরা বলিল, “দরজীর বাড়ী যেতে হবে। গায়ের মাপ দিতে হবে, পোশাক পরতে হবে।”

কাঁকড়া জলেও চলে, ডাঙাতেও চলে। ঠিক হইল, সে কঙ্কাবতীকে নিয়া দরজীর কাছে যাইবে। কচ্ছপের পিঠে টাকা মোহর লইয়া যাওয়া হইবে।• যত টাকা লাগে কঙ্কাবতীর জন্য ভাল কাপড়জামা করিতে হইবে। কাঁকড়া রাজী হইয়া ভাল কাপড় পরিয়া মাথা আঁচড়াইয়া ফিটফাট হইয়া তৈয়ারি হইল। কচ্ছপের পিঠে টাকা মোহর বোঝাই দেওয়া হইল।

তাহারা দরজীর বাড়ী চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজবেশ

কঙ্কাবতী কি করে? সকলের অনুরোধে তাহাদের সঙ্গে গেল। কাঁকড়া মহাশয় আগে, কঙ্কাবতী মাঝখানে আর পিছনে টাকার বস্তা পিঠে কচ্ছপ, তিনজনে এইভাবে চলিল। চলিতে চলিতে অনেক পাহাড়পর্বত বনজঙ্গল পার হইয়া শেষে তাহারা বুড়া দরজীর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। বুড়া দরজী চশমা নাকে দিয়া কাঁচি হাতে করিয়া কাপড় কাটিতেছিল।

কঙ্কাবতীরা কাছে আসিতেই সে বলিল, "এই যে কাঁকড়াভায়া, এস এস, ভাল আছ তো। তা কি মনে করে?"

বুড়া দরজী

কাঁকড়া বলিলেন, "এই কঙ্কাবতীকে আমরা রানী করেছি এর জন্য ভাল জামা চাই, তাই তোমার কাছে এসেছি।"

দরজী বলিল, "বটে, বটে, তা বেশ আমার কাছে অনেক-রকম ভাল জামা আছে। তোমাদের রানী কঙ্কাবতী যদি শিমুল তুলা হয় তো লাল খেরোর জামা আছে, সুন্দর সেলাই। এখন টিপে দেখ তো কঙ্কাবতী শিমুল তুলা কিনা ?"

দাঁড়া দিয়া কাঁকড়ামহাশয় কঙ্কাবতীর গা টিপিয়া টুপিয়া দেখিয়া বলিলেন, "কৈ, না; সেরকম তো মনে হয় না।"

কঙ্কাবতী তাহাদের কথা শুনিয়া চটিয়া গেল। বলিল, "তোমরা কি আমাকে খেরোর খোল পরিয়ে বালিশ করবে নাকি ?"

দরজী উত্তর দিল, "ঈশ্, মেয়ের যে আস্বা ভারি! বালিশ হবে না তো কি তাকিয়া হবে ?"

দরজীর বকুনিতে কঙ্কাবতীর বড় দুঃখ হইল; সে কাঁদিতে লাগিল।

কাঁকড়ামহাশয় বলিলেন, "তুমি ছেলেমানুষ, আমাদের কথায় কথা কও কেন ? তোমার যাতে ভাল হয় আমরা তাই করব। তুমি কেঁদো না চুপ করো।" এই বলিয়া কাঁকড়া-মহাশয় বড় দাঁড়া দিয়া কঙ্কাবতীর মুখ মুছাইয়া দিলেন। কঙ্কাবতীর মুখ ছড়িয়া গেল।

দরজী বলিল, "তাই তো, এর গায়ের জামা তো আমার কাছে নেই। তা এক কাজ কর, খলিফা সাহেবের কাছে যাও; তার মত কারিগর এ পৃথিবীতে নেই। তার কাছে এমন জামা আছে যা পরলে খাঁদারও নাক হয়।"

এই কথায় কাঁকড়ার রাগ হইল। সে বলিল, "তুমি কি ঠাট্টা করছ নাকি? না হয় তোমার নাক বড়, আমার নাক ছোট। তাই বলে ঠাট্টা করবে?"

দরজী তাড়াতাড়ি বলিল, "না, না, তোমায় আমি ঠাট্টা করতে পারি? তোমার নাকটা মন্দ কি? না হয় দেখাই যায় না।"

দরজীর কথায় কাঁকড়ামহাশয়ের রাগ পড়িল।

এদিকে কঙ্কাবতী ভাবিতে লাগিল, আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি। কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিল না।

দরজীর কাছে বিদায় লইয়া তখন তাহারা খলিফার বাড়ী রওনা হইল। অনেক দূর গিয়া তিনজনে শেষে খলিফা সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। খলিফা তখন অন্দরমহলে ছিল, কাঁকড়ার ডাকে বাহিরে আসিয়া আদর করিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। কঙ্কাবতীকে দেখিয়া খলিফা বলিল, "দিব্যি মেয়েটি তো! কাঁকড়াবাবু, এ কন্যাটি কি আপনার?"

কাঁকড়া কঙ্কাবতীর পরিচয় দিলেন আর বলিলেন এর জন্য রাজপোষাক করিয়া দিতে হইবে। খলিফা বলিল, "পোষাক আমি করে দিতে পারি; কিন্তু টাকা দিতে পারবেন? এর জন্য দুই তোড়া টাকা চাই।"

কাঁকড়া তখনই কচ্ছপের পিঠ হইতে দুই তোড়া মোহর তুলিয়া আনিয়া খলিফার হাতে দিল; মোহর দেখিয়া খলিফার আর আহ্লাদ ধরে না। সে বলিল, "আপনারা বসুন আমি টাকাটা ঘরে রেখে আসি, এসে এখনই জামা তৈয়ারি করে

দেব।" এই বলিয়া খলিফা তোড়া দুটি লইয়া অন্দরে গেল। মোহর দেখিয়া খলিফানী তো অবাক। সে এক গাল হাসিয়া খলিফাকে বলিল, "এবার কিন্তু আমায় ডায়মনকাটা তাবিজ গড়িয়ে দিতে হবে।"

তারপর খলিফা কঙ্কাবতীকে বাড়ীর ভিতরে আনিল। সেখানে খলিফানী তাহার গায়ের মাপ লইল। খলিফা তখনই অনেক লোক লাগাইয়া সেই মাপে জামা করিয়া ফেলিল। খলিফানী কঙ্কাবতীকে আদর করিয়া সেই জামা পরাইয়া দিল। রাজপোষাক পরিয়া কঙ্কাবতীর রূপ ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

পোষাক পরা হইলে কাঁকড়া ও কচ্ছপ কঙ্কাবতীকে লইয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন এবং স্থলে জলে অনেক পথ চলিয়া শেষে নদীর ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কঙ্কাবতীর পোষাক দেখিয়া সকলেই 'ধন্য', 'ধন্য', করিতে লাগিল।

মাছেদের এখন ভাবনা হইল, "এহেন সুন্দরী রানী, তিনি থাকেন কোথায়?" অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে ঠিক হইল কঙ্কাবতী মতিমহলে থাকিবেন। তখন তাহারা কঙ্কাবতীকে একটি ঝিনুক দেখাইয়া দিল। ঝিনুকের ভিতরে মুক্তা হয় বলিয়া ঝিনুকের নাম মতিমহল। কঙ্কাবতী সেই ঝিনুকের মধ্যে ঢুকিল এবং ঝিনুকের ভিতরে থাকিয়া কঙ্কাবতী মাছেদের রানীগিরি করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গয়লানী মাসী

এইভাবে কিছুদিন যায়। একদিন এক গয়লানী নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছে। তাহার পায়ে সেই ঝিনুকটি ঠেকিল। ডুব দিয়া সে ঝিনুকটি তুলিয়া দেখে চমৎকার ঝিনুক! সে সেটি বাড়ী লইয়া গিয়া চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিয়া দিল।

বাইরের দরজায় তালা দিয়া গয়লানী লোকের বাড়ীতে দুধ দিতে যায়। সেই সময়ে কঙ্কাবতী ঝিনুকের ভিতর হইতে বাহির হয়। প্রথমদিন সে যেমন ঝিনুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া মাটিতে পা দিল অমনি তাহার রাজবেশ কোথায় মিলাইয়া গেল। তাহার জায়গায় তাহার পুরানো বেশ ফিরিয়া আসিল। সেই অবধি সেই বেশই আছে। প্রতিদিন ঝিনুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কঙ্কাবতী গয়লানীর ঘরদোর পরিষ্কার করিয়া রাখে। কাজকর্ম করিয়া রাখে। গয়লানী ফিরিয়া আসিয়া দেখে আর অবাক হয়; সে বুঝিতেই পারে না কে এমন করে। এমন রোজ হইতে লাগিল।

গয়লানী ঠিক করিল, ধরিতে হবে। এই ভাবিয়া একদিন সকাল সকাল চুপি চুপি বাড়ী ফিরিল। পা টিপিয়া আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া দেখে একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে তাহার বাসন মাজিতেছে।

কঙ্কাবতী টের পাইয়া ঝিনুকের ভিতর লুকাইতে গেল, কিন্তু গয়লানী তাহার আগেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ধরিয়া দেখে না কঙ্কাবতী।

অবাক হইয়া গয়লানী বলিল, "কঙ্কাবতী, তুমি এখানে? তুমি এখানে কেমন করে এলে? তুমি না নদীর জলে ডুবে গিয়েছিলে?"

কঙ্কাবতী উত্তর দিল, "হাঁ মাসি! আমি কঙ্কাবতী। নদীর জলে ডুবে গিয়েছিলাম। নদীতে আমি ঐ ঝিনুকটির ভিতরে থাকতাম; তুমি সেটা কুড়িয়ে আনলে, সেইসঙ্গে আমিও এসেছি।"

গয়লানী এখন বুঝিল, আশ্চর্য হইবার আর কিছু থাকিল না।

কঙ্কাবতী বলিল, "মাসি, আমি যে এখানে আছি সেকথা তুমি কাউকে বোলো না। শুধু হাতে বাড়ী ফিরলে বাবা বকবেন। জলের ভিতর আমি অনেক টাকা দেখেছি। তারা দরজীকে দিল, আমাকে দিল না। আমি কত চাইলাম, কত কাঁদলাম। আবার চেষ্টা করে দেখি যদি কিছু দেয়। তা হলে বাবা বকবেন না, দাদাও গাল দেবে না।"

গয়লানী দুঃখ করিয়া বলিল, "আহা, এমন মেয়েও কি কারো হয়?"

ঠিক হইল কঙ্কাবতী কিছুদিন গয়লানীর কাছে থাকিবে।

গয়লানী রোজ দুধ দিয়া ফিরিয়া আসিয়া পাড়ার গল্প

বলে ; একদিন সে বলিল, "আহা, খেতুর মার বড় অসুখ, জ্বরবিকার।" শুনিয়া কঙ্কাবতী বড় উতলা হইল, বলিল, "তিনি আমার মায়ের মত, অনেক করেছেন, আমি তাঁর সেবা করতে পারলাম না। মনে বড় দুঃখ রয়ে গেল।"

পরদিন আসিয়া গয়লানী খবর দিল, "আহা বড় দুঃখের কথা! খেতুর মা মারা গেছেন; তাঁকে ঘাটে নিয়ে যাবার লোক জুটছে না। তোমার বাবা লোককে মানা করে বেড়াচ্ছেন, খেতুর জাত নাই, যেন কেউ না যায়।"

খবরটা শুনিয়া কঙ্কাবতী একেবারে শুইয়া পড়িল, কেবলই কাঁদিতে লাগিল। গয়লানী তাহাকে কত বুঝাইল কিছুতেই মানিল না।

সন্ধ্যাবেলায় গয়লানী গিয়া খবর লইয়া আসিল খেতু একা এই অন্ধকার রাত্রে অতিকষ্টে মার দেহ শ্মশানে লইয়া যাইতেছে, কেহ তাহাকে সাহায্য করিতে আসে নাই। শুনিয়া কঙ্কাবতী পাগলের মত শ্মশানের দিকে ছুটিয়া গেল। গয়লানী তাহাকে কতবার ডাকিল, শুনিল না। তখন গয়লানী কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিল।

এদিকে কঙ্কাবতী যেখানে খেতু তার মার দেহ লইয়া একা বসিয়া কাঁদিতেছে সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। খেতু তাহাকে দেখিয়া অবাক হইল, বলিল, "কঙ্কাবতী, এত দুঃখ আমার, এমন সময়ে কিনা তুমিও আমায় দুঃখ দেবার জন্য ভূত হয়ে এসেছ!"

কাঁদ কাঁদ স্বরে কঙ্কাবতী উত্তর দিল, "আমি ভূত হই নি, মরি নি। সে অনেক কথা, পরে বলব। আমি গয়লানী মাসীর বাড়ী ছিলাম; তার কাছে খবর শুনে ছুটে এসেছি। চল, এখন দুজনে ধরে মাকে ঘাটে নিয়ে যাই, তুমি একদিক ধর আমি আর একদিক ধরি।"

তখন তাহারা দুজনে ধরিয়া মার দেহ শ্মশানে লইয়া গেল, সেখানে চিতা সাজাইয়া, মুখাগ্নি করিয়া চিতায় আগুন দিল। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

শ্মশানের কাজ শেষ হইলে দুইজনে স্নান করিল। তখন খেতু কঙ্কাবতীকে বলিল, "চল, তোমাকে তোমার বাবার কাছে রেখে আসি।" কঙ্কাবতী প্রথমটা আপত্তি করিল, শেষে খেতুর কথায় রাজী হইল। দুইজনে কথা বলিতে বলিতে গ্রামের দিকে চলিল। তখন সবে ভোর হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে দুজনে তনু রায়ের দরজায় আসিয়া পৌঁছিল। তখন খেতু কঙ্কাবতীর কাছে বিদায় লইল, বলিল, "কঙ্কাবতী, খুব সাবধানে থেকো, কেঁদো না। বেঁচে থাকলে আমি এক বৎসর পরে নিশ্চয় আসব। তখন আমাদের সকল দুঃখ ঘুচবে। তোমার মাকে সব কথা বোলো, আর কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।" এই বলিয়া খেতু চলিয়া গেল। কঙ্কাবতী একদৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাপের বাড়ী

খেতু চলিয়া গেলে কঙ্কাবতী অনেকক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিল ; অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহার দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিবার সাহস হইল না। শেষে সাহসে বুক বাঁধিয়া সে দরজা ঠেলিল। তনু রায় তখন ঘুম হইতে উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। কে দরজা ঠেলিতেছে দেখিবার জন্য দরজা খুলিয়া দিলেন, দেখিলেন কঙ্কাবতী। দেখিয়াই বলিলেন, "একি কঙ্কাবতী ! তুমি মর নি ? এতদিন কোথায় ছিলে ? যেখানে ছিলে সেখানে যাও, এ বাড়ীতে আর তোমার স্থান হবে না।"

কঙ্কাবতী শুনিয়া আর ভিতরে গেল না। সেইখানেই দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। তনু রায়ের তর্জনগর্জন শুনিয়া তাহার ছেলেও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও আসিয়া বোনকে "দূর", "দূর" করিয়া গালাগালি করিতে লাগিল।

গোলমাল শুনিয়া আর দুই মেয়েকে লইয়া কঙ্কাবতীর মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেয়েকে দেখিয়া তিনি "এতদিন কোথায় মাকে ভুলে ছিলি মা" ? বলিয়া জড়াইয়া ধরিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন। তাহার পর স্বামীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা কঙ্কাবতীকে দূর করে দেবে ? কেন, বাছা আমার কি করেছে ? তা বেশ তোমরা থাকো, আমরা যাই।" এই বলিয়া তিনি একহাতে কঙ্কাবতী ও আর এক-

হাতে আর এক মেয়ের হাত ধরিয়া বাড়ীর বাহিরে যাইবার উপক্রম করিলেন। তখন তনু রায়ের ভয় হইল; তিনি বলিলেন, "গিন্নী, পাগল হলে নাকি? এখন এ মেয়েকে ঘরে নিয়ে কি করব? এর কি আর বিয়ে হবে? তাই বলছি ওর যেখানে খুশী চলে যাক্, আমরাও বাঁচি।"

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন, "এর বিয়ে হবে কি না হবে সে কথা তোমায় ভাবতে হবে না। আসলে তোমার ভাবনা তো যে জনার্দন চৌধুরীর টাকা হাতছাড়া হয়ে গেল। তা তোমার টাকা তোমার থাক্। তোমরা সুখে থাকো। আমরা যেখানে দুচোখ যায় চলে যাই। না হয় ভিক্ষা করেই খাব, তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকব না।"

স্ত্রীর উগ্রমূর্তি দেখিয়া তনু রায় ভাবিলেন মহাগণ্ডগোল। তখন উপায় না দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তবে না হয় কঙ্কাবতী থাক্।"

তখন সকলে বাড়ীর ভিতরে আসিল।

কঙ্কাবতী বাপের বাড়ীতেই থাকিতে লাগিল। মাকে একে একে সে সব কথা খুলিয়া বলিল। কিন্তু সে কথা সে বা তাহার মা কেহই আর কাহাকেও বলিলেন না।

এইভাবে দিন কাটিয়া যায়।

এদিকে তনু রায় প্রায়ই কঙ্কাবতীকে বকেন, নানারকম গালমন্দ দেন। তবে স্ত্রীর সম্মুখে তাহাকে কিছু বলিতে তাঁহার সাহস হয় না। কিন্তু তিনি প্রায়ই স্ত্রীকে খোঁটা দিয়া

বলেন, "কৈ তুমি তো বলেছিলে কঙ্কাবতীর বিয়ের জন্য আমায় ভাবতে হবে না। কৈ বর কৈ? কে এ মেয়েকে বিয়ে করবে?" তাঁহার স্ত্রী বলেন, "সে তুমি ভেবো না। মেয়ের বিয়ে আমি নিজে দেব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঘ

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। খেতুর দেখা নাই, কোনও খবরও নাই। কঙ্কাবতী আর কঙ্কাবতীর মার বড় ভাবনা হইল। এদিকে যতই দিন যায় ততই তনু রায়ের বকুনি বাড়ে, কঙ্কাবতীর মা অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া থাকেন, কোন কথা বলিতে পারেন না।

একদিন সন্ধ্যার পর তনু রায় রাগ করিয়া বলিলেন, "এত বড় মেয়ে হল, এদিকে বর জুটল না। এখন একে নিয়ে করি কি? তুমি তো এতদিন আমায় থামিয়ে রেখেছ পাত্র এনে দেবে বলে। কোথায় পাত্র, আর কোথায় কি? তোমার জন্যেই আমার এই বিপদ। এখন দেখছি সেকালের রাজারা যা করতেন আমাকেও বুঝি তাই করতে হয়। যাকে সামনে পাব তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেব। রাগে আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে। আমি সত্যই বলছি, যদি এই মুহূর্তে একটা বনের বাঘ এসে কঙ্কাবতীকে বিয়ে করতে চায়, তো আমি তার সঙ্গেই

কঙ্কাবতীর বিয়ে দিই। যদি বাঘ এসে বলে 'রায়মশায়, দরজা খুলে দিন', তো আমি নিশ্চয়ই দরজা খুলে তাকে ডেকে আনি।"

এই কথা বলিতে বলিতে বাহিরে ভীষণ গর্জনের শব্দ হইল। গর্জন করিয়া কে বলিল, "রায়মশায়, তবে কি দরজা খুলে দেবেন ?"

শব্দ শুনিয়া ভয়ে তনু রায়ের মুখ শুকাইয়া গেল। দরজার কাছে কে এমন গর্জন করিতেছে দেখিবার জন্য তিনি দরজা খুলিলেন। খুলিয়া দেখেন প্রকাণ্ড একটা বাঘ বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।

বাঘ বলিল, "রায়মশায়, এইমাত্র আপনি সত্য করেছেন যে একটা বাঘ এসে যদি কঙ্কাবতীকে বিয়ে করতে চায় তো তার সঙ্গে আপনি তার বিয়ে দেবেন। তাই আমি এসেছি। আপনি এখনই যদি কঙ্কাবতীর সঙ্গে আমার বিয়ে না দেন তো আমি আপনাকে খেয়ে ফেলব।"

বাঘের কথায় তনু রায় ভয় পাইলেন বটে, কিন্তু নিজের স্বভাবটি ভুলিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "কথা দিয়েছি তখন বিয়ে আমি দেব ; কিন্তু ব্রাহ্মণের জামাই হতে হলে আমার মান রাখতে হবে।"

বাঘ জিজ্ঞাসা করিল, "কত হলে আপনার মান রক্ষা হবে ? কত টাকা হলে আপনি মেয়ে বেচবেন বলুন।"

তনু রায়ের তখন একটু সাহস হইয়াছে। তিনি বলিলেন "জনার্দন চৌধুরী যা দেবে বলেছিল তার চেয়ে কিছু বেশী না হলে কেমন করে হয়।"

বাঘ বলিল, "বেশ আমি তার চেয়ে অনেক বেশী দেব। যা আপনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি আমি তাই দেব। বাড়ীর ভিতরে চলুন।"

তনু রায় আর কি করেন, বাঘকে লইয়া ভিতরে ঢুকিলেন। সেখানে কঙ্কাবতীরা সকলে বসিয়াছিল। বাঘের ডাকে তাহাদের মূর্চ্ছার মত হইয়াছিল, এখন বাঘকে ভিতরে ঢুকিতে দেখিয়া তাহারা ভয়ে যেন কাঠ হইয়া গেল।

বাঘ সকলের সামনে একটা প্রকাণ্ড তোড়া ফেলিয়া দিয়া তনু রায়কে বলিল, "খুলে দেখুন।"

তনু রায় তোড়া খুলিয়া দেখেন তাহার ভিতরে কেবল মোহর! হাতে করিয়া চশমা নাকে দিয়া আলোর কাছে গিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন, মেকি নয়, সত্যিকারের মোহর। তাঁহার মনে আর আনন্দ ধরে না। তিনি প্রদীপের কাছে গিয়া মোহর গণিতে বসিলেন।

এই অবসরে বাঘ কঙ্কাবতীর মার কাছে গিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "কোনও ভয় নেই।"

তাহার গলার স্বর শুনিয়া কঙ্কাবতী ও তাহার মা এক মুহূর্তে বুঝিতে পারিলেন এ কার কণ্ঠস্বর। তখন তাঁহাদের মনেও সাহস হইল। তাঁহারা দুজনে মনে মনে ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন।

বাঘ এই কথা বলিয়া তনু রায়ের কাছে গিয়া থাবা পাতিয়া বসিয়া রহিল। তনু রায় গণিয়া দেখিলেন তিন হাজার মোহর আছে।

বাঘ বলিল, "তবে এখন ?"

তনু রায় বলিলেন, "আমি যখন কথা দিয়েছি তখন আমার কথার নড়চড় হবে না। এখন জনার্দন চৌধুরী দূরে থাক, তার বাবা এলেও এর অন্যথা হবে না। আমি এই রাত্রেই তোমার সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিয়ে দেব।" তিনি মেয়েদের ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা সব জোগাড় কর।"

সেই রাত্রেই বাঘের সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিবাহ হইয়া গেল।

ভোর হইবার আগে বাঘ বলিল, "রাত থাকতেই আমাকে যেতে হবে আপনারা মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে দিন।"

পাড়ার মেয়েরা আসিয়া কঙ্কাবতীর চুল বাঁধিয়া দিল। কঙ্কাবতীর মা ভাল ভাল কাপড়গুলি বাছিয়া পুঁটলি সাজাইতে বসিলেন। তাহা দেখিয়া তনু রায় বলিলেন, "তোমার মত বোকা আর দেখি নি ; বাঘের কি জামা কাপড়ের, না গহনা-পত্তরের ভাবনা ! সে দোকানে গিয়ে "হালুম" করে পড়বে, আর দোকানী প্রাণের দায়ে সব ফেলে পালাবে। তখন সে যত খুশী ভাল ভাল জামা কাপড় গহনাপত্তর নিয়ে আসবে। তাহলে ভাল ভাল জিনিস ঘর থেকে দেওয়া কেন ? তাই বলি তোমার মত বোকা ভূ-ভারতে নেই।"

স্বামীর বকুনিতে তনু রায়ের স্ত্রী দুএকখানি ছেঁড়া নেকড়া পুঁটলি বাঁধিয়া দিলেন। সেটি মেয়ের হাতে দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরদের ডাকিতে ডাকিতে কন্যাকে বিদায় করিলেন। কঙ্কাবতী স্বামীর বাড়ী চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বনে

পুঁটলি হাতে করিয়া কঙ্কাবতী বাঘের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাঘ বলিল, "কঙ্কাবতী, তুমি ছেলেমানুষ, পথ চলতে পারবে না। তুমি আমার পিঠে চড়, আমি তোমাকে নিয়ে যাই।"

কঙ্কাবতী গাছ-কোমর বাঁধিয়া বাঘের পিঠে চড়িয়া বসলে, বাঘ বনের দিকে ছুটিয়া চলিল। গহন বনের ভিতর আসিয়া বাঘ জিজ্ঞাসা করিল, "কঙ্কাবতী, তোমার কি ভয় করছে?" কঙ্কাবতী উত্তর দিল "তোমার সঙ্গে আবার ভয় কি?" বাঘ বলিল, "কেন আমি বাঘ হয়েছি সে কথা তোমাকে পরে বলব। তুমি কিছু ভেবো না আমি শীগ্‌গিরই এ দশা হতে মুক্তি পাব। এখন তুমি আর আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না।"

কথা বলিতে বলিতে দুজনে খুব বড় একটা পাহাড়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঘ বলিল, "কঙ্কাবতী, এইবার তুমি একটু চোখ বুজে থাক, যতক্ষণ না বলি চোখ খুলো না।"

খানিকক্ষণ পরে কঙ্কাবতী খল খল করিয়া এক বিকট হাসি শুনিতে পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিল "কে অমন করে হাসল?" বাঘ বলিল, "সেসব কথা তোমায় পরে বলব; এখন তোমার শুনে কাজ নেই। এখন চেয়ে দেখ। আর কোন ভয়ও নেই।"

বাঘের পিঠে কঙ্কাবতী

কঙ্কাবতী চোখ খুলিয়া দেখে তাহারা শ্বেত পাথরের তৈয়ারি প্রকাণ্ড একটা বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছে। তাহার ঘরগুলি সুন্দর সাজান; সেখানে কত ধনরত্ন। চারিদিকে রাশি রাশি মণি মুক্তা হীরা স্তূপাকারে পড়িয়া আছে।

বাড়ীটি পাহাড়ের ভিতরে। বাহির হইতে দেখা যায় না। পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট সুড়ঙ্গ আছে, সেইটা দিয়াই এখানে আসিতে হয়, আর কোন পথ নাই। কিন্তু বাড়ীর ভিতরে চমৎকার আলো-হাওয়া আসে। সেখানে এক খাবার জিনিস ছাড়া আর কোন জিনিসেরই অভাব নাই।

বাঘ সেখানে কঙ্কাবতীকে পিঠ হইতে নামাইয়া দিয়া বলিল, "তুমি এখানে বসে থাক, আমি আসছি। কিন্তু সাবধান, আমি নিজে না দিলে এখানকার কোন জিনিসে হাত দিও না।" এই বলিয়া বাঘ সেখান হইতে চলিয়া গেল।

খানিক পরে খেতু আসিয়া কঙ্কাবতীর সামনে দাঁড়াইল। খেতু জিজ্ঞাসা করিল, "কঙ্কাবতী, আমায় চিনতে পার?" কঙ্কাবতী, ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। খেতু জিজ্ঞাসা করিল, "কঙ্কাবতী, তোমার কি ভয় করছে?" কঙ্কাবতী বলিল, "না আমার ভয় করছে না।"

খেতু জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, যখন আমাদের বিয়ে হল তখন তুমি আমায় চিনতে পেরেছিলে?" কঙ্কাবতী উত্তর দিল, "তা আর পারি নি?"

খেতু বলিল, "শোন, এখানে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। তবে এখানে মস্ত বড় একটা বিপদ আছে, সেটা কি

তুমি আমায় এখন জিজ্ঞাসা কোরো না। তবে তোমাকে এইটুকুই শুধু বলে রাখি যদি তুমি এখানকার কোন জিনিসে হাত না দাও, তাহলে কোন বিপদ হবে না। এক বৎসর আমাদের এখানে থাকতে হবে। তারপর এই ধনসম্পত্তি সব আমাদের হবে। তখন আমরা দেশে ফিরে যাব।”

খেতু আর কঙ্কাবতী সেখানে সুখে বাস করিতে লাগিল। কঙ্কাবতী সেখানকার কোন জিনিসে হাত দেয় না, খেতু হাতে তুলিয়া যাহা দেয় তাহাই নেয়। খেতু প্রতিদিন বনে গিয়া ফলমূল আনে তাহাই খাইয়া তাহাদের দিন কাটে। বাহিরে যাইবার সময় খেতু বাঘ হইয়া যায়, ফিরিয়া আসিয়া আবার মানুষ হয়। এইভাবে দশ মাস কাটিয়া গেল।

একদিন কঙ্কাবতী বলিল, “অনেকদিন মাকে দেখি নি, বড় মন কেমন করছে।” খেতু বলিল “আর তো দু মাস আছে, দু মাস পরেই তো আমরা দেশে ফিরে যাব। না হয় এক কাজ কর, তোমাকে আমি তোমার মায়ের কাছে রেখে আসি। সেখানে এ দুমাস তুমি থাক গে।” কঙ্কাবতী বলিল, “না, তা আমি থাকতে চাই না। তবে মার জন্য মন কেমন করছে। মাকে দেখেই আবার ফিরে আসব।”

তার পরদিন খেতু বাঘ হইয়া কঙ্কাবতীকে পিঠে করিয়া শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিল। সুড়ঙ্গের মুখ হইতে বাহির হইবার সময় খেতু আবার কঙ্কাবতীকে চোখ বুজিতে বলিল, আর কঙ্কাবতী আবার সেই বিকট হাসি শুনিতে পাইল। ভয়ে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল।

বন পার হইয়া যখন তাহারা দুজনে গ্রামে আসিল তখন রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে। তাহাদের পাইয়া বাড়ীতে সকলেই খুব খুশী হইল। বাঘ অনেক টাকা মোহর দিয়া তনু রায়কে নমস্কার করিল। মা কঙ্কাবতীকে আদর যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। এখন তনু রায়ের ভাবনা হইল জামাইকে কি খাইতে দেন। অনেক বুদ্ধি করিয়া বলিলেন, "বাবাজী, এত পথ এসেছ, ক্ষিধে নিশ্চয়ই পেয়েছে। এখন তোমায় কি খেতে দিই ? আমরা তো ভাত ডাল খাই, তাতে তোমার চলবে না। এক কাজ কর ; আমার একটা বুড়ী গাই আছে, দুধ দেয় না কেবল বসে বসে খায়। তাকেই খেয়ে ফেল।"

বাঘ বলিল, "আমার ক্ষিধে নেই। আমি আপনার গাইকে খেতে পারব না।"

তনু রায় তখন বলিলেন, "বেশ তো, তাহলে আর একটা কাজ কর, নিরঞ্জন কবিরত্নকে খাও ; সে ভারি দুষ্টু, কেবল আমার শত্রুতা করে।"

বাঘ বলিল, "আমি খেয়ে এসেছি, ক্ষিধে নেই ; আমি কবিরত্নকে খাব না।"

তনু রায় নাছোড়বান্দা ; বলিলেন, "তাহলে অন্তত এই গাঁয়ের গয়লানী বুড়ীকে খাও। সে নাকি আমায় গাল দেয়, আর বলে বাঘকে মেয়ে বেচেছি। দুধ খেয়ে খেয়ে তার রক্ত খুব মিষ্টি হয়েছে ; তাকে খাও, তোমার খুব ভাল লাগবে।"

বাঘ কিছুতেই রাজী হইল না। তনু রায় বলিলেন, "যাক্, এবার না হয় খেলে না, আসছে বার যখন আসবে তখন কিন্তু এদের খেতে হবে।"

কঙ্কাবতী সমস্ত রাত্রি তার মা আর বোনেদের সঙ্গে গল্প করিল। বাঘ যে কে মাকে সে কথা বলিল, আর দুমাস পরে তারা যে অনেক টাকাকড়ি লইয়া দেশে ফিরিবে সে কথাও বলিল।

তনু রায় একবার চুপি চুপি কঙ্কাবতীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার মনে হয় জামাই সত্যিকারের বাঘ নন্। বনের শিকড় মাথায় দিয়ে মানুষ যে বাঘ হয় ইনি বোধ হয় তাই। তুমি দেখো দেখি এর মাথায় কোন শিকড় আছে কি না। পেলে পুড়িয়ে দিলে ভাল হবে, আর বাঘ হয়ে থাকতে হবে না।"

কঙ্কাবতী মাকে গিয়া এইসব কথা বলিতেই তাহার মা বলিলেন "খবরদার, ওসব কোরো না। খেতু যা বলবে তাই মেনে চোলো। কিছুতেই তার কথা অমান্য কোরো না।"

কথায় কথায় ভোর হইয়া আসিল। তখন বাঘ কঙ্কাবতীকে নিয়া আবার বনে ফিরিয়া গেল আর সেখানে আগেকার মত বাস করিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শিকড়

আরও একমাস কাটিয়া গেল। খেতু বলিল, "কঙ্কাবতী, আর একমাস, একমাস পরেই আমাদের দুঃখ ঘুচবে।" তাহার পর হইতে তাহারা দুজনে দিন গণিতে লাগিল। এক একটি দিন যায়, আর খেতু বলে, "আর বাইশ দিন রইল, আর একুশ দিন রইল।" এমনি করিয়া আরও কুড়ি দিন কাটিয়া গেল।

কঙ্কাবতী দেখিল স্বামীর দেশে ফিরিবার আগ্রহ; তিনি কেবলই দিন গুণিতেছেন। তাহার নিজের প্রাণও ব্যাকুল হইয়াছিল। তাহার মনে হইল স্বামীকে কি তাড়াতাড়ি উদ্ধার করা যায় না? বাবা যা বলিয়াছেন তা করিলে তো এই দশ দিনও আর অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় না। কঙ্কাবতীর বড় লোভ হইল। কিন্তু তখনই তার মায়ের কথা মনে পড়িল। মা মানা করিয়াছেন। কঙ্কাবতী কি করিবে ঠিক করিতে পারিল না।

সেদিন সারাদিন ধরিয়া কঙ্কাবতীর মনে সু আর কু'র লড়াই চলিল। কু বলে, "কেন, বাবা যা বলেছেন করো না, একদিনে সব দুঃখ ঘুচে যাবে।" সু বলে "মার কথা মনে নেই? খবরদার, ওসব কাজ করো না।"

কঙ্কাবতীর মনে হইল "করি না করি, যাই, দেখি না সত্যিই শিকড় আছে কিনা।" খেতু তখন অঘোরে ঘুমাইতেছিল। কঙ্কাবতী চুপি চুপি প্রদীপ লইয়া গিয়া তাহার মাথার কাছে

গিয়া দেখিল সত্যিই খেতুর মাথার চুলের ভিতর একটা শিকড় রহিয়াছে। কঙ্কাবতী শিকড়টি খুলিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। তখন সে একটা কাঁচি লইয়া আসিয়া খানিকটা চুলের সঙ্গে শিকড়টি কাটিয়া লইয়া প্রদীপে পোড়াইয়া ফেলিল।

শিকড় পুড়িতেই ঘরের ভিতরে একটা ভীষণ দুর্গন্ধ বাহির হইল। ভয়ে কঙ্কাবতীর সর্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। দুর্গন্ধ নাকে যাইতেই খেতু চমকিয়া জাগিয়া উঠিল, মাথায় হাত দিয়া দেখিল শিকড় নাই। কঙ্কাবতী তাহার সামনে দাঁড়াইয়া ভয়ে যেন অজ্ঞান হইয়া যাইতেছে। খেতু তাহাকে ধরিয়া পাশে বসাইল।

কঙ্কাবতী বলিল, "আমি যে কি অন্যায় করেছি তা বুঝতে পারছি। তুমি আমায় ক্ষমা করো।" এই কথা বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

খেতু বলিল, "আমারই ভুল হয়েছে; তোমাকে যদি প্রথমেই সকল কথা খুলে বলতাম, তাহলে তুমি এ কাজ করতে না। আজ এমন হতো না। শিকড়টা কি প্রদীপে পুড়িয়ে ফেলেছো?"

কঙ্কাবতী ঘাড় নাড়িল।

খেতু বলিল, "তা যা হবার হয়েছে। এখন আমার যা হয় হবে, কিন্তু তোমার যেন বিপদ না ঘটে। তুমি এখান হতে পালাও। আমি এখানকার জিনিস নিয়েছি আমি পালাতে পারব্ না। কিন্তু তুমি পারবে, তুমি এখানকার কিছুতে হাত

দাও নি। দশ দিন পরে তুমি ফিরে এসো ; এসে এই বাড়ীতে যা কিছু ধনসম্পত্তি টাকাকড়ি আছে নিয়ে যেও। নিয়ে গিয়ে সেটাকে চার ভাগ করো; একভাগ রামহরি দাদাকে দিও, একভাগ তোমার বাবাকে, আর একভাগ নিরঞ্জন কাকাকে। বাকি তুমি নিও। সেই টাকায় যে কটা দিন বাঁচো দানধ্যান ধর্মকর্ম করে কাটিয়ে দিও। স্বর্গে আবার তোমায় আমায় দেখা হবে।"

কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'তোমার কথায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমি কি অন্যায় করলাম! আমার যা হয় হবে, এখন তোমার কি হবে তাই আমায় বল।"

খেতু বলিল, "তবে শোন। এই টাকাকড়ি ধনঐশ্বর্য সব নাকেশ্বরী নামে এক ভূতিনীর। সে সুড়ঙ্গের মুখে বসে দিন-রাত্রি পাহারা দিচ্ছে। তুমি যে খল খল হাসি শুনেছিলে সে সেই নাকেশ্বরীর হাসি। যে এখানকার ধন নেবে নাকেশ্বরী তাকে খেয়ে ফেলবে। আমি এই ধন নিয়েছি। কিন্তু আমাকে সে পারে না, কারণ এতদিন আমার মাথায় সেই শিকড় ছিল বলে। তা না হলে সে কোন্ দিন আমায় খেয়ে ফেলত। শিকড় নেই একথা নাকেশ্বরী বোধ হয় এখনও জানতে পারে নি। পেলে আমার আর রক্ষা নেই। একে তো এখান থেকে পালাবার উপায় নেই। তা ছাড়া পালিয়েও উপায় নেই, কারণ যেখানেই যাই না কেন সে আমায় মেরে ফেলবে।"

এই কথা শুনিতেই কঙ্কাবতী খেতুর পা-দুটি ধরিয়া শুইয় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

খেতু বলিল, " কেঁদো না, ওঠ। আস্তে আস্তে সুড়ঙ্গের বাহিরে যাও ; আমি যা বললাম তাই করো। মায়ের কাছে গেলে মনটা তবুও কিছু সুস্থ হবে।"

কঙ্কাবতী তখন উঠিয়া বসিল। বসিয়া বলিল, "না, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। আমি এইখানেই থাকব নাকেশ্বরীর হাত হতে তোমাকে উদ্ধার করতে পারি তো ভাল না পারলে তোমারও যা হবে, আমারও তাই হবে। আমি মরতে ভয় করি না। তোমায় নাকেশ্বরীর হাতে ফেলে নিজের প্রাণ নিয়ে পালাব এমন মেয়ে আমি নই।"

খেতু দেখিল কঙ্কাবতীকে বোঝান বৃথা, সে কোন কথাই শুনিবে না।

সে বলিল, "বেশ, যখন তুমি যাবেই না, তখন তোমাকে সকল কথা খুলে বলি, শোন। কথা শেষ করতে পারব কিনা জানি না, হয়তো শিকড় পোড়ার গন্ধ পেয়ে নাকেশ্বরী তার আগেই এসে পড়বে। তবুও বলি।"

"মাকে পুড়িয়ে আমি কলকাতায় না গিয়ে কাশী গেলাম। সেখানে মায়ের শ্রাদ্ধ শেষ করলাম। তারপর কাজকর্ম খুঁজতে লাগলাম। একটা ভাল কাজও জুটে গেল, খাটুনি খুব বেশী, কিন্তু মাইনেও অনেক। আমার তখন একমাত্র লক্ষ্য, টাকা জমাবো, জমিয়ে তোমার বাবাকে এনে দেব। কোন খরচ না করে আমি টাকা জমাতে লাগলাম। এইরকম

রে অতি কষ্টে এক বৎসর কাটালাম। এক বৎসরে আমার
হাজার টাকা জমল। তখন আমি সেই টাকা নিয়ে
শে রওনা হলাম। ভাবলাম, এইবার টাকা পেলে তোমার
বার আর কোন আপত্তি থাকবে না। কিন্তু এমনই
ামার দুর্ভাগ্য যে গাড়ীতে সে টাকা চুরি গেল। একটা লোক
ামাকে বিষমাখা খাবার দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে আমার টাকাকড়ি,
াপড়চোপড়, সব নিয়ে পালিয়ে গেল। ঘুম ভেঙে উঠে দেখি
াগ নেই, কিছুই নেই। এত কষ্ট করে এক বৎসর ধরে যা
মিয়েছিলাম সে সব গেছে। তখন আমার মনের অবস্থা
ঝতেই পারো। আমি বুঝলাম, আমার সকল আশা আজ
র্মূল হল, তোমার সঙ্গে আর আমার বিয়ে হল না।

এই অবস্থায় আমি রানীগঞ্জে নামলাম। সেখান থেকে
ামাদের গাঁয়ে আসবার দুটো পথ আছে জান তো, একটা
জপথ, সেটা একটু ঘোরা, আর একটা বনপথ, সে পথে
নের ভিতর দিয়ে আসতে হয়, সেটা সোজা। সে পথে
াড়াতাড়ি আসা যায়, কিন্তু সে পথে বাঘ ভালুক আছে, তাই
াকে বড় যাতায়াত করে না। আমি কিন্তু সেই পথেই
লাম। চার দিন সেই পথে চলবার পর আমাদের গাঁয়ের
াশে যে বড় পাহাড় আছে তারই নীচে এসে পৌঁছলাম।
থান থেকে আমাদের গাঁ এক দিনের পথ। চারধারে গহন
া। সেই বনের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে
াল। আমি পথ হারালাম। শেষে আর চলতে পারি না,
ধে তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়। আর পা চলে না। এমন

সময়ে সামনে একটা ভাঙা মন্দির দেখতে পেলাম। অ
কষ্টে সেখানে গেলাম; গিয়ে দেখি সেখানে দেবদেবী নেই
লোকজন নেই। আমি তখন সেখানেই শুয়ে পড়লাম।"

কঙ্কাবতী বলিল, "তারপর?"

নবম পরিচ্ছেদ

ভূত কোম্পানী

খেতু বলিতে লাগিল, "দুপুর রাত্রে সবে চোখে ঘুম আমা
এসেছে, এমন সময় মন্দিরের সিঁড়িতে ঠক্ ঠক্ করে শব্দ হ
লাগল। চেয়ে দেখি একটা মড়ার মাথা লাফিয়ে লাফি
সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। ভয় আমার নেই, তবুও ব্যাপার
দেখে আমারও একটু যে ভয় হল না এমন নয়। আমি উ
বসলাম। মাথাটা আমার সামনে ঝুলতে লাগল; তার মু
জোড়া হাঁ। দাঁতের পাটি বের করে ভূতটা আমায় জিজ্ঞা
করল, "তুমি নাকি ভূত মানো না?" আমার ভারি রাগ হ
আমি বললাম, "নিজের জ্বালায় মরচি ইনি এসে জিজ্ঞা
করছেন আমি ভূত মানি কিনা। যান—যান আমায় অ
জ্বালাতন করবেন না।"

আমার কথায় মুণ্ডটার আরও রাগ হল। সে বল
"ইংরেজী পড়ে তুমি নাকি ভূত মানো না?" আমি বলল
"না মানলে বুঝি আপনাদের রাগ হয়?" মুণ্ডটা বলি
"রাগ হবে না তো কি শরীর জুড়িয়ে যাবে? লোকে বে

বলবে যে ভূত নেই? কেন বাপু, আমরা তোমাদের কি করেছি যে আমাদের একেবারে উড়িয়ে দেবে?"

এত দুঃখেও আমার হাসি পেল। আমি বললাম, "তা ঠিক, এটা ওদের অন্যায়।"

আমার কথায় ভূতটা একটু ঠাণ্ডা হল। সে বলল, "তুমি ছোকরা দেখছি ভাল। তাহলে শোনো: লোকে যাতে ভূত বিশ্বাস করে, ভূতকে ভক্তি করে সেইজন্যে আমরা একটা কোম্পানী খুলেছি তার নাম দিয়েছি 'স্কল স্কেলিটন এণ্ড কোং।' ইংরেজী নাম রেখেছি কেন জানো? তাহলে লোকে খাতির করে বেশী; ভাবো যদি 'খুলি কঙ্কাল এবং কোম্পানী' নাম রাখতাম তাহলে কি লোকে খাতির করত।"

এমন সময়ে একটা কঙ্কাল তার হাড় ঝম্ ঝম্ করতে করতে সেখানে এসে হাজির হল। তার মাথা নেই; শুধু দেহটির হাড়গুলি আছে। আমি বুঝলাম ইনিই স্কল স্কেলিটন এণ্ড কোং-এর স্কেলিটন।

তখন স্কল আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন এখন ভূতে বিশ্বাস হল তো?" আমি বললাম, "ভূতের উপর বিশ্বাস আমার আগে হতেই আছে। আপনাদের সেজন্যে ভাবতে হবে না। আপনারা এখন যান, ঘরের লোক ভাববে। আমাকেও একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে; কাল সকালে অনেকখানি পথ চলতে হবে।"

স্কল তখন স্কেলিটনকে বলল—"দেখলে ভায়া, কোম্পানী খোলবার উপকার!"
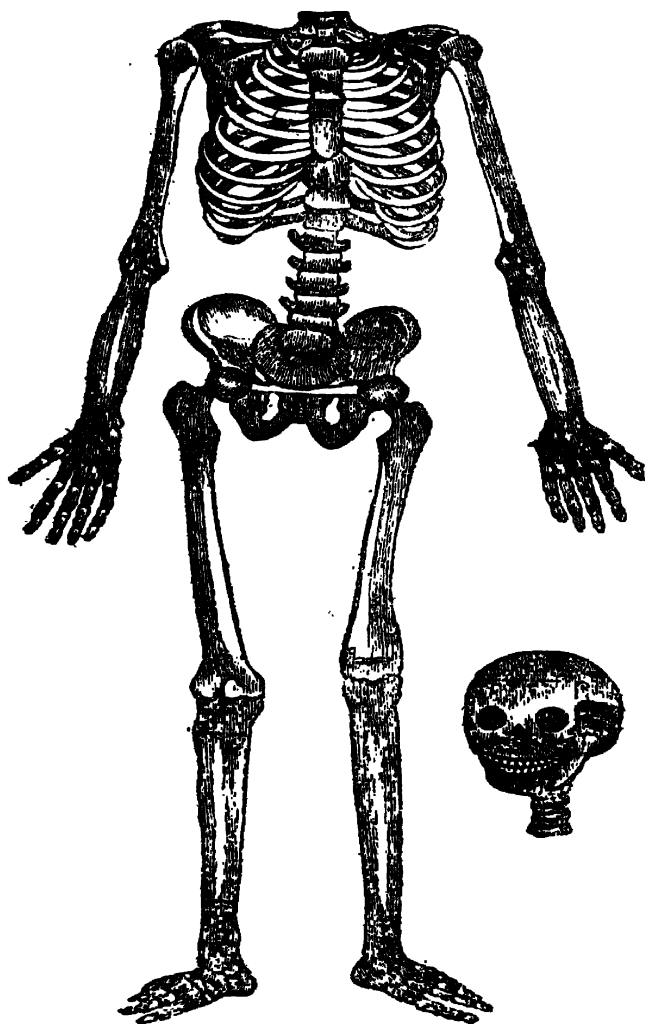
স্কল স্কেলিটন এণ্ড কোম্পানী

স্কেলিটন বোধ হয় আমার ভূতের উপর ভক্তি দেখে খুশী হয়েছিল। বলল, "ইনি যদি ভূতভক্ত হন তাহলে এঁর ভক্তির জন্য একটা পুরস্কার তো দিতে হয়। পুরস্কার পেলে এঁর ভক্তিও বাড়বে, লোকে এঁর কাছ থেকে শুনে আমাদের ভক্তি করবে।" আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "না, না, আমার টাকাকড়ি চাই না; এমনই আমার ভক্তি ঠিক থাকবে।"

আমার কথায় স্কল আরও খুশী হয়ে উঠল; "তা হয় না; তোমাকে আমাদের জমানো টাকা নিতে হবে। বেঁচে থাকতে আমরা সে টাকার সদ্ব্যবহার করি নি। এখন তোমার হাতে তার সদ্ব্যবহার হলে আমাদের উপকার হবে; সে ধন তোমাকে নিতে হবে।"

আমি অনেক বললাম কিন্তু স্কল বা স্কেলিটন কেউই শুনল না। অগত্যা আমায় রাজি হতে হল। আমি তাদের সঙ্গে চললাম। অনেক পথ চলে আমরা এই পাহাড়ের কাছে এলাম। এখানে পাহাড়ের গায়ে বন পরিষ্কার করে তিনজনে মিলে সুড়ঙ্গের পথটি খুললাম। সুড়ঙ্গের দরজায় নাকেশ্বরীকে দেখলাম। সে আমাদের দেখে খল খল করে হেসে উঠল কিন্তু যেমন স্কল তার দিকে চাইল অমনি সে চুপ করে গেল। তখন সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে আমরা এখানে এলাম। এই টাকাকড়ি ধনরত্ন দেখে আমি তো অবাক্। স্কল বলল, "এই ধনসম্পত্তির মালিক আমরা দুজন। হাজার বছর আগে আমরা ছিলাম এখানকার রাজা। বেঁচে

থাকতে কেবল টাকাই জমিয়েছিলাম, ধর্মকর্ম কিছুই করি নি। মরে গেলে পাছে এই ধন অন্যে নেয় তাই ধনের উপর যক দিয়েছিলাম। যক রেখেছিলাম একটা ভূতিনীকে; তার নাম নাকেশ্বরী। তাকে বলেছিলাম হাজার বছর

নাকেশ্বরী অতি সুন্দরী ভূতিনী

তোমাকে এই ধন পাহারা দিতে হবে; এর মধ্যে যদি কেউ এর এক কণাও নেয় তাহলে তুমি তাকে মেরে ফেলবে। হাজার বছর হয়ে গেলে তোমার যেখানে খুশী যেও; তখন যার অদৃষ্টে থাকে সে এই ধন পাবে। যক রাখার পর যুদ্ধে

মারা পড়ি। শত্রুর তরয়ালে ধর আর মুণ্ড আলাদা হয়ে যায়। বেঁচে থাকতে ছিলাম এক, মরে ভূত হয়ে হলাম দুই ; মুণ্ডটি হলাম আমি স্কল আর ধড়টি হলেন আমার স্কেলিটন ভায়া। আমরা দুজনেই এই ধনসম্পত্তির মালিক। আমরা এখন তোমাকে দিলাম। সেই হাজার বছরের ৯৯৯ বছর হয়ে গেছে, আর এক বছর বাকি। এক বছর হয়ে গেলে নাকেশ্বরী এ ধন ছেড়ে চলে যাবে। নাকেশ্বরী অতি সুন্দরী ভূতিনী। গত পৌষমাসে নাকেশ্বরীর সঙ্গে ঘ্যাঁঘোঁ নামে এক

ঘ্যাঁঘোঁ

ভূতের বিয়ে হয়েছে। নাকেশ্বরী এক বছর পরে সেই ঘ্যাঁঘোঁর কাছে যাবে। তখন তুমি এ ধন নিলে কোন আর বিপদ থাকবে না। কিন্তু খবরদার, এই এক বছর তুমি এর

এক কণাও ছুঁয়ো না, ছুঁলে নাকেশ্বরী তোমাকে খেয়ে ফেলবে।”

আমি বললাম, “তা না হয় হল ; কিন্তু এই এক বছর আমি বাঁচি কি করে ? এর মধ্যে যে আমার কিছু চাই, নইলে কেমন করে চলবে ?”

আমার কথা শুনে তারা দুজনে কি পরামর্শ করল। করে বলল, “চল আমাদের সঙ্গে।” তিনজনে আবার বনে ফিরে এলাম। সেখানে ভূত দুজন একটা শিকড় এনে আটা দিয়ে আমার মাথার চুলে এঁটে বেঁধে দিল।

আবার আমরা পাহাড়ের ভিতরে বাড়ীতে ফিরে এলাম। সেখানে ভূত দুজন আমায় বলল, “বাড়ীর ভিতরে যতক্ষণ শিকড় তোমার মাথায় থাকবে ততক্ষণ নাকেশ্বরী তোমার কিছু করতে পারবে না। বাড়ীর বাইরে কিন্তু শিকড় তোমায় বাঁচাতে পারবে না। তবে শিকড়ের আর একটা গুণ আছে, এটা মাথায় থাকলে তোমার যা খুশী সেই জন্তুর আকার ধারণ করতে পারবে। বাঘ হল নাকেশ্বরীর ইষ্টদেবতা ; তাই যখন তুমি বাড়ীর বাইরে যাবে বাঘ হয়ে যেও, তাহলে নাকেশ্বরী তোমার কিছু করতে পারবে না। এরপর তুমি এখান থেকে দরকার মত টাকাকড়ি ধনরত্ন নিতে পারবে।”

এই বলে স্কল আর স্কেলিটন আমায় সেখানে রেখে চলে গেল। তারপরের সব কথা, কঙ্কাবতী, তুমি জানো। সেকথা আর তোমায় বলবার দরকার নেই।”

দশম পরিচ্ছেদ

নাকেশ্বরী

খেতুর কথা শেষ হইতে না হইতে ভীষণ একটা চীৎকারে বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল—ঘরের চারিদিক যেন অন্ধকার হইয়া গেল। খেতু বলিল, "ঐ নাকেশ্বরী আসছে।"

কঙ্কাবতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দরজায় ঠেশ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, নাকেশ্বরীকে সে ভিতরে আসিতে দিবে না।

হঠাৎ অন্ধকার যেন কাটিয়া গেল। কঙ্কাবতী চাহিয়া দেখে খেতু অজ্ঞান হইয়া চক্ষু বুঁজিয়া বিছানায় পড়িয়া আছে আর তাহার পাশে নাকেশ্বরী দাঁড়াইয়া আছে। কঙ্কাবতী গিয়া নাকেশ্বরীর পায়ে পড়িল; বলিল, "ওগো তুমি আমার স্বামীকে মেরো না। আমি বড় দুঃখিনী। তুমি আমার স্বামীকে না মেরে আমায় মেরে ফেল। আমি তোমার এ ধনরত্ন কিছুই চাই না, শুধু আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দাও।"

কঙ্কাবতী এইরকম করিয়া কত কাঁদিল কিন্তু তাহাতে নাকেশ্বরীর মনে একটুও দয়া হইল না। সে শুধু "দূর! দূর!" বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল।

তখন রাগে দুঃখে কঙ্কাবতী নাকেশ্বরীকে বলিল, "আমার স্বামীকেও দেবে না? আমাকেও খাবে না? তা নাকেশ্বরীই হও আর যেই হও, আজ তোমার একদিন, কি আমার একদিন।" এই বলিয়া সে নাকেশ্বরীকে ধরিতে গেল।

নাকেশ্বরী তখন খুব জোরে একটা ফুঁ দিল, সেই ফুঁয়ে কঙ্কাবতী ছিটকাইয়া দরজার কাছে গিয়া পড়িল।

কঙ্কাবতী পাগলের মত আবার ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে গেল। এবার নাকেশ্বরী এমন জোরে ফুঁ দিল যে কঙ্কাবতী একেবারে বাড়ীর বাহিরে পাহাড়ের বাহিরে বনের মাঝখানে গিয়া পড়িল।

বনের মাঝে কঙ্কাবতী একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িল। তার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল; রক্ত পড়িতেছিল। কঙ্কাবতীর এখন আর উঠিবার শক্তি নাই। সে সেইখানেই শুইয়া শুইয়া কাঁদিতে লাগিল; সে যে স্বামীর পায়ের কাছে মরিতে পারিল না এইটাই তাহার সকলের চেয়ে বড় দুঃখ।

কাঁদিতে কাঁদিতে কঙ্কাবতীর মনে হইল, "তাই তো, সংসারে অনেক গুণী লোক আছে যারা ভূতপ্রেতের হাত হতে মানুষকে রক্ষা করতে পারে; আমার স্বামীকেও তারা বাঁচাতে পারবে না কেন? আমি তারই জন্য চেষ্টা করি। চুপ করে পড়ে থাকলে চলবে না, চেষ্টা করে দেখতে হবে।" এই বলিয়া কঙ্কাবতী উঠিয়া লোকালয়ের দিকে চলিল। কিন্তু পথ চেনা নাই, কোন্ দিকে যাইবে? এদিকে দেরী করা চলে না। দেরী হইলে হয়তো সব পণ্ড হইয়া যাইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ব্যাঙসাহেব

বনজঙ্গল খানাডোবা পার হইয়া পাগলের মত কঙ্কাবতী চলিল। কত পথ গেল কিন্তু লোকালয় দেখিতে পাইল না। রাত্রি প্রভাত হইল, সূর্য উঠিল, দিন বাড়িতে লাগিল তবু জনমানবের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল না।

"কি করি, কোন্ দিকে যাই, কাকে জিজ্ঞাসা করি", কঙ্কাবতী এইরকম ভাবিতেছে এমন সময়ে সে সামনে একটি ব্যাঙ দেখিতে পাইল। ব্যাঙের অপূর্ব মূর্তি! মাথায় হ্যাট, গায়ে কোট, কোমরে পেন্টুলুন। এদিকে পায়ে জুতা নাই। ব্যাঙসাহেব দুই পকেটে দুই হাত রাখিয়া সদর্পে চলিতেছেন।

এই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া ঘোর দুঃখেও কঙ্কাবতীর মুখে হাসি দেখা দিল। সে ভাবিল, "একেই পথ জিজ্ঞাসা করি।"

কঙ্কাবতী ব্যাঙকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাঙমশায়, গাঁ কোন্ দিকে? কোন্ পথে গেলে গাঁয়ে পৌঁছব?"

ব্যাঙ উত্তর দিল, "হিট মিট ফ্যাট।"

কঙ্কাবতী বলিল, "আপনি কি বলছেন বুঝতে পারলাম না।"

ব্যাঙ বলিল, "হিশ ফিশ ড্যাম।"

কঙ্কাবতী বলিল, "আপনি বুঝি ইংরেজী বলছেন। আমি তো ইংরেজী পড়ি নি; আপনি যদি দয়া করে বাংলায় বলেন তো বুঝি।"

ব্যাঙসাহেব

ব্যাঙ চারিদিক চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। বাংলায় কথা বলিলে অন্য কেহ জানিতে পারিবে না বা তাহাকে মন্দ বলিতে পারিবে না। তখন বাংলায় কথা বলিবার তাহার সাহস হইল। সে বলিল, "কোথাকার বোকা মেয়ে! দেখ্‌ছ না আমি সাহেব, তা নয় কেবল 'ব্যাঙমশায়', 'ব্যাঙমশায়' বলে ডাকছে? কেন সাহেব বললে কি হয়?"

কঙ্কাবতী দেখে মহাবিপদ। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "ব্যাঙ-সাহেব, আমার ভুল হয়েছে—আমায় মাপ করুন। এখন কোন্ দিকে গাঁয়ে যাব বলে দিন।"

এই কথা শুনিয়া ব্যাঙ আরও জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, "আ মোলো যা, মেয়েটার রকম দেখ। মানা করলেও গ্রাহ্য নেই। কেবল বলবে ব্যাঙ, ব্যাঙ, ব্যাঙ। কেন আমার নাম ধরে ডাকলে কি হয়? আমার নাম মিষ্টার গমিশ।"

কঙ্কাবতী বলিল, "মিষ্টার গমিশ, আমার অপরাধ হয়েছে; আমায় মাপ করুন, এখন আপনি আমায় দয়া করে গ্রামের পথ দেখিয়ে দিন্।"

মিষ্টার গমিশ বলিয়া ডাকাতে ব্যাঙ প্রসন্ন হইল। বলিল, "দেখ লঙ্কাবতী, তোমার নাম লঙ্কাবতী বললে না? তা দেখ লঙ্কাবতী, হাতীর সঙ্গে আমার বড় ঝগড়া সে আমায় কিনা ডিঙিয়ে যায়। তাই আমি তাকে বললাম,

'উট্‌কপালী চিরুণদাঁতী বড় যে ডিঙুলি মোরে।'

তাই শুনে হতভাগা হাতী কিনা বলে,

'থাক্ থাক্ থাক্ থ্যাবড়ানাকী ধর্মে রেখেছে তোরে।'

তার কি আস্পর্ধা বল তো ? আমায় কিনা বলে থ্যাবড়া-নাকী ! আমার এমন নাক ! কি বল লঙ্কাবতী ?”

কঙ্কাবতী বলিল, “আমার নাম কঙ্কাবতী, লঙ্কাবতী নয়। না, না, কে বলে আপনার নাক থ্যাবড়া। কেমন সুন্দর আপনার নাক। তা আমার গাঁয়ে যাবার পথ বলে দিন।”

ব্যাঙ বলিল, “হাতীর কাছে অপমান হবার পর আমি ঠিক করেছি যে সাহেব হব। সাহেব না হলে লোকে মান্য করে না। সেইজন্যে এই সাহেবের পোষাক পরেছি। আমায় কেমন মানিয়েছে বলো তো। ঠিক সাহেবের মত দেখাচ্ছে না ? এখন থেকে সকলে আমায় সেলাম করবে, ভয় করবে। কেমন না ?”

কঙ্কাবতী বলিল, “নিশ্চয়। কিন্তু এবার আমার পথটা বলে দিন।”

কানে হাত দিয়া ব্যাঙ বলিল, “কি বললে ?”

কঙ্কাবতী বলিল, “আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন পথে গ্রামে যাব, গ্রাম এখান থেকে কতদূর ? সেখানে কতক্ষণে গিয়ে পৌঁছব।”

ব্যাঙ বলিল, “দাঁড়াও, বলচি ; আগে আমার একটা হিসেব করে দাও তো। আমি মহাবিপদে পরেছি। আমার একটা আধুলি ছিল, একজনকে আমি সেটা ধার দিয়েছি। তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে সে রোজ আমায় আগের দিনের অর্ধেক ফেরৎ দেবে। প্রথম দিন দেবে চার আনা, দ্বিতীয় দিন দেবে দু আনা, তৃতীয় দিন এক আনা তার পর দিন দু পয়সা

তার পর দিন—দাঁড়াও এক পয়সায় হয় পাঁচ গণ্ডা মানে কুড়ি কড়া ; তাহলে তার পর দিন দেবে দশ কড়া তারপর দিন পাঁচ কড়া তারপর দিন আড়াই কড়া—”

বলিতে বলিতেই ব্যাঙ গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল “ওগো মাগো, তাহলে এ যে আর কখনও শোধ হবে না গো! আমার আধুলিটা কখনও পুরো হবে না গো! আমি কোথায় যাবো গো! আমি যে জুয়াচোরের পাল্লায় পড়লাম গো! ওগো আমার ঐ আধুলিটা ছাড়া আর কিছু নেই গো!”

খানিক পরে ব্যাঙ একটু থামিয়া বলিল, “ওগো আমি তোমার সঙ্গে দুদণ্ড গল্পগাছা করব ভেবেছিলাম গো! সে আর হোলো না গো! আমার যে সব গেল গো! তুমি ঐদিক দিয়ে যাও গো! তাহলে গাঁয়ে পৌঁছতে পারবে গো! কিন্তু সে যে অনেক দূর গো! ওগো তুমি সেখানে আজ পৌঁছতে পারবে না গো! ওগো তোমরা যে আমার মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে পারো না গো! তোমরা যে গুটি গুটি চলো গো! আমার যে তাই দেখে হাসি পায় গো! ওগো, আমার কি হবে গো! আমার যে ওই আধুলিটা ছাড়া আর কিছু নেই গো! ওগো মাগো!”

এই বলিয়া ব্যাঙ ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পচাজল

ব্যাঙ যে পথ দেখাইয়া দিল কঙ্কাবতী সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কঙ্কাবতী আর চলিতে পারে না। তখন সে বনের মাঝখানে একটা পাথরে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পাথরের উপরে বসিয়া কঙ্কাবতী কাঁদিতেছে। এমন সময়ে কে যেন গুন্‌গুন্‌ করিয়া তাহার কানে বলিল, "তোমরা কারা গো! তুমি কাদের মেয়ে গো!"

কঙ্কাবতী এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। শেষে দেখিল যে একটা ছোট মশা তার কানে এই কথা বলিতেছে। কঙ্কাবতী ভাল করিয়া দেখিল। দেখিল সেটি নেহাতই বালিকা-মশা।

কঙ্কাবতী উত্তর দিল, "আমি মানুষের মেয়ে গো! আমার নাম কঙ্কাবতী।" মশা-বালিকা বলিল, "মানুষের মেয়ে! আমাদের খাবার? বাবা যাদের রক্ত নিয়ে আসেন? খাই বটে কিন্তু মানুষ কখনও দেখি নি। মানুষ কোন্ গাছে হয় তাও জানি না। দেখি দেখি, মানুষ কেমন দেখতে!"

এই বলিয়া মশা-বালিকা কঙ্কাবতীর চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া দেখিতে লাগিল। দেখিয়া বলিল, "তুমি বুঝি ধাড়ি নও, ছেলেমানুষ! আমারই মত বাচ্ছা! তা বেশ! আমার নাম রক্তবতী, তোমার নাম কঙ্কাবতী। আমাদের নামে নামে বেশ মিল হয়েছে। এস আমরা কিছু একটা পাতাই।"

কঙ্কাবতী বলিল, "কিছু পাতিয়ে আমোদ আহ্লাদ করি এমন আমার সময় নয়—আমার স্বামী হারিয়েছে তারই দুঃখে আমি মরছি।"

রক্তবতী বলিল, "তোমার স্বামী হারিয়েছে? তার ভাবনা কি? বাবা এলে বলে দেব তিনি তোমায় একটা স্বামী খুঁজে এনে দেবেন। এখন এস আমরা দুজনে একটা কিছু পাতাই। কি পাতাই বল তো? দাঁড়াও, আমি পচাজল বড় ভালবাসি। তোমার সঙ্গে পচাজল পাতাই। কি বলো? তুমি আমার পচাজল, আমি তোমার পচাজল, কেমন? এখন মনের মত হয়েছে তো?"

কঙ্কাবতী ভাবিল ইহার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, চুপ করিয়া থাকাই ভাল। সে মুখে বলিল, "বেশ, তুমি আমার পচাজল, আমি তোমার পচাজল!"

রক্তবতী তখন কঙ্কাবতীর সঙ্গে নানারকম গল্প করিতে লাগিল। সে একবার জিজ্ঞাসা করিল, "পচাজল তোমার আর দুটো পা কোথায়? ভেঙে গেছে বুঝি! তাই বুঝি তুমি কাঁদছ? তা কেঁদো না; আবার পা হবে; আমারও ভেঙে গিয়েছিল আবার হয়েছে।"

খানিক পরে রক্তবতী জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ ভাই পচাজল, তোমার নাক কই!" কঙ্কাবতী বুঝিল সে শুঁড়ের কথা বলিতেছে। এইরকমে দুইজনে অনেক কথা হইল। রক্তবতীই বেশী কথা বলিল।

কঙ্কাবতী কেবলই ভাবিতেছে "ব্যাঙ আর মশার জ্বালায় ভাল বিপদেই পড়েছি ; কোথায় তাড়াতাড়ি গাঁয়ে ফিরে গিয়ে স্বামীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করব,—না পচাজল—আর পচা-জল !"

রক্তবতী বলিল, "ঐ যে পাতাটা দেখছ, তার কোণটি কুঁকড়ে আছে ওর ভিতরে আমাদের ঘর। আমার বাবা আর মা-রা থাকেন। আমার তিন মা। আমি তাঁদের কথা বলি।" এই বলিয়া রক্তবতী উড়িয়া গেল ; খানিক পরে আসিয়া বলিল "পচাজল, চল, আমার মার সঙ্গে দেখা করবে।"

কঙ্কাবতী আর কি করে ? উঠিয়া পাতাটির কাছে গেল। এক মশানী পাতার ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "হ্যাঁ গা বাছা ! তুমি বুঝি আমার রক্তবতীর সঙ্গে পচাজল পাতিয়েছ ? বেশ ! বেশ ! তা ও তোমার স্বামীর কথা কি বলছিল ?"

কঙ্কাবতী বলিল, "ওগো আমার স্বামীকে নাকেশ্বরী খেয়েছে ; তাঁকে বাঁচাতে আমি গাঁয়ে যাচ্ছি, যদি ভাল বদ্যি পাই। কিন্তু কোন্ পথে যাব জানি না। এই অন্ধকারে পথও দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা যদি আমায় পথটা দেখিয়ে দাও তো আমার বড় উপকার হয়।"

মশানী বলিল, "তুমি ছেলেমানুষ, কিছু বোঝো না। আমরা কি যে সে মশার স্ত্রী যে ঘরের বাইরে যাই ? উনি আসুন্ ; এলে না হয় যা হয় একটা করা যাবে।"

ইতিমধ্যে আর এক মশানী পাতার ভিতর হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া মুখ বাড়াইল। সে হইল বড় মশানী, মশার পাটরাণী।

বড় মশানী বলিল, "ওটা একটা মানুষের ছানা বুঝি! তা বেশ হয়েছে ওকে আমি পুষব; আমার ছেলেপিলে নেই।"

মেজ মশানী আর এক পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া বলিল, "দিদি, তোমার এক কথা! যদি পুষতে হয় ঠিকমত পোষো, যেমন মানুষে গরু পোষে তেমনই। ঘরে একটা মানুষ পোষা থাকলে যখন ইচ্ছা টাটকা রক্ত খেতে পাবে।"

রক্তবতীর মা বলিল, "তোমাদের সব এক কথা। সব তাতেই তোমাদের দরকার। রক্তবতী ওকে পথে কুড়িয়ে পেয়েছে ও তোমাদের দেবে কেন? কর্তা আসুন তোমাদের সব মতলব তাঁকে বলব। দেখি তিনি কি করেন!"

এই কথায় তিন মশানীতে ধুন্ধুমার ঝগড়া বাধিয়া গেল। কঙ্কাবতী দেখিল ভাল বিপদ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মশা প্রভু

তিন সতীনে তুমুল লড়াই কাজিয়া চলিতেছে এমন সময়ে মশা বাড়ী আসিলেন। ঘরে কচকচি শুনিয়া মশার সর্বশরীর জ্বলিয়া গেল। সে রাগ করিয়া বলিল, "তোমাদের ঝগড়ার

জ্বালায় ঘরের কাছে গাছের ডালে কাক চিল বসতে পারে না। আমারও ইচ্ছা হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরি। এই সেদিন ধর্মে ধর্মে প্রাণটা কোনমতে বেঁচেছে। এক আফিমখোরের গায়ে বসেছিলাম। কি তেঁতো তার রক্ত! একশুঁড় রক্ত সব ফেলে দিতে হল! বার বার কুলকুচো করে তবে প্রাণ বাঁচল । কিন্তু তোমাদের জ্বালায় আর বুঝি বাঁচি না।"

স্বামীর রাগ দেখিয়া সতীনদের লড়াই থামিল। খানিক পরে মশার রাগ থামিল। তখন রক্তবতী গিয়া তার কোলে বসিল। বলিল, "বাবা, আমার পচাজল এসেছে।"

মশা জিজ্ঞাসা করিল, "পচাজল আবার কি ?"

তখন রক্তবতীর মা সব কথা বলিল, আর বলিল, "কঙ্কাবতী যখন আমার মেয়ের পচাজল তখন তার দুঃখ দূর করতে হবে।"

মশা জিজ্ঞাসা করিল, "সে মানুষের মেয়েটি কোথায় ?" রক্তবতীর মা বলিল, "ওই বাইরে বসে আছে।"

তখন মশা ও রক্তবতী উড়িয়া কঙ্কাবতীর কাছে আসিল ; মশাকে দেখিতেই কঙ্কাবতী হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল।

মশা বলিল, "আমি তোমায় সাহায্য করব, তার আগে আমার জানা চাই তুমি কার সম্পত্তি।"

কঙ্কাবতী কিছুই বুঝিতে পারে না সে আবার কাহার সম্পত্তি। মশা তখন বুঝাইয়া বলিল, পৃথিবীর সকল মানুষ মশাদের ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; একজনের ভাগে আর একজন কিছু করিতে পারে না। কঙ্কাবতী বলিতে পারে না

সে কোন্ মশার ভাগে পড়িয়াছে। তখন মশা তাহার গ্রামের নাম খোঁজ করিয়া দূত পাঠাইল; তাহারা সব খবর লইয়া আসিয়া জানাইল কঙ্কাবতীর মালিক তিনটি মশা; তাহাদের নাম গজগণ্ড, বৃহৎমুণ্ড, বিকৃতমুণ্ড। রক্তবতীর বাপের নাম দীর্ঘশুণ্ড। দীর্ঘশুণ্ড তখন গজগণ্ড ও আর দুই মশার কাছে প্রস্তাব পাঠাইল কঙ্কাবতীকে কিনিবার জন্য। শেষে অনেক দরাদরির পর তিনছটাক নররক্ত দিয়া দীর্ঘশুণ্ড কঙ্কাবতীকে কিনিয়া লইল। তখন আর তাহাকে সাহায্য করিবার বাধা রহিল না।

দীর্ঘশুণ্ড বলিল, "নাকেশ্বরী তোমার স্বামীকে খেয়েছে। এখন নাকেশ্বরীর হাত হতে বাঁচাতে পারে এমন একটি মাত্র লোককে আমি জানি, সে আমার তালুকে থাকে। তার নাম খর্বুর মহারাজ। লোকটা গুণী। তাকে দেখলে ভূত পালায়। সে অনেক মন্ত্রতন্ত্র জানে।"

কঙ্কাবতী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তাহলে আর দেরী করা নয়, এখনই তার কাছে চলুন যাই।"

রক্তবতীর বাবা বলিল, "বাছা আমার তালুক তো নেহাৎ কাছে নয়। দাঁড়াও আমার ছোট ভাইকে ডেকে পাঠাই, তার পিঠে চড়ে সকলে যাওয়া যাবে।"

মশা তার ছোট ভাইকে ডাকাইয়া পাঠাইল। ছোট ভাই আসিয়া উপস্থিত হইল। মশানীরা তাকে 'হাতী ঠাকুরপো', 'হাতী ঠাকুরপো' বলিয়া অনেক আদরযত্ন ও ঠাট্টাতামাসা

করিল। বনের সকলেই তাহাকে ‘হাতী ঠাকুরপো’ বলিয়া ডাকে।

রক্তবতী তাহাকে বলিল, “কাকা, এই দেখ আমি এক মানুষের ছানা পেয়েছি। এর সঙ্গে আমি ‘পচাজল’ পাতিয়েছি। এ আমাকে খুব ভালবাসে। আমি একে খুব ভালবাসি।”

কঙ্কাবতী তো অবাক্। মশার ছোট ভাই প্রকাণ্ড এক হাতী।

রক্তবতীর বাবা হাতীকে বলিল, “ভায়া, বড় বিপদে পড়েছি। রক্তবতী এক মানুষের মেয়ের সঙ্গে ‘পচাজল’ পাতিয়েছে। মেয়েটির স্বামীকে নাকেশ্বরী খেয়েছে। তাই এ কেবল কাঁদছে। আমার ইচ্ছে এর স্বামীকে উদ্ধার করে দিই। কিন্তু সে কাজ পারবে এক খর্বুর মহারাজ। কিন্তু মানুষের মেয়েটি কেঁদে কেঁদে আর পথ চলতে পারবে না; তাই তোমাকে ডেকেছি; যদি ভাই তুমি আমাদের পিঠে করে নিয়ে যাও তো বড় উপকার হয়।”

হাতী ঠাকুরপো রাজি হইল। তখন কঙ্কাবতী মশানী ও রক্তবতীর নিকট হইতে বিদায় লইল। তারপর মশা ও সে হাতীর পিঠে চড়িয়া খর্বুরের বাড়ী রওনা হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

খর্বুর

সারারাত চলিয়া যখন মশা ও কঙ্কাবতী খর্বুরের বাড়ীর কাছে আসিয়া পৌঁছাইল তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; আকাশে চাঁদ আছে। খর্বুর ইহারই মধ্যে বিছানা হইতে উঠিয়া দরজার কাছে মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে। খর্বুরের মুখ ভার দেখিয়া আকাশে চাঁদের মুখে আর হাসি ধরে না। তাই দেখিয়া খর্বুরের ভারি রাগ হইল; সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল "এই চাঁদকে আমি দেখে নেব।"

মশা, কঙ্কাবতী ও হাতী খর্বুরের বাড়ী উপস্থিত হইল। মশাকে দেখিয়া খর্বুর ব্যস্ত হইয়া হাত জোড় করিয়া বলিল 'রোজ সন্ধ্যায় আসেন আজ দিনের বেলায় যে?"

মশা বলিল, "বলছি, কিন্তু আগে শুনি তোমার মুখ ভার কেন?"

খর্বুর বলিল, "হুজুর, আমাদের স্বামীস্ত্রীতে প্রায়ই মারামারি হয় কিন্তু আমি তার সঙ্গে কোনদিনই পারি না; আমি তিন হাত লম্বা, সে সাত হাত লম্বা। তার সঙ্গে আমি পারব কেমন করে? কিন্তু স্ত্রীর কাছে হেরে গিয়ে আমার মন বড় খারাপ হয়ে গেছে।"

মশা বলিল, "কোন ভাবনা নেই; আজ তুমি হাতী ভায়ার পিঠে চড়ে স্ত্রীর সঙ্গে মারামারি করো, নিশ্চয় পারবে।"

খর্বুর খুশী হইয়া হাতীর পিঠে চড়িয়া বাড়ীর ভিতর গিয় স্ত্রীর সঙ্গে মারামারি করিতে গেল। স্ত্রী পারিবে কেন

খর্বুর

খানিক পরেই সে মার খাইয়া হার মানিল। খর্বুরের অ আনন্দ ধরে না। সে মশাকে বার বার ধন্যবাদ দিল

তাহার পর কি জন্য তাহারা আসিয়াছে সে কথা জিজ্ঞাসা করিল।

উত্তরে মশা আদ্যোপান্ত সকল কথা শুনাইল। খর্বুর শুনিয়া বলিল, "আপনাদের কোন ভাবনা নেই। নাকেশ্বরীর াত হতে কঙ্কাবতীর স্বামীকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করে দেব। এখন লুন নাকেশ্বরীর কাছে যাই।" তখন আবার তাহারা সেই পাহাড়ের দিকে যেখানে নাকেশ্বরী থাকে সেখানে যাত্রা করিল এবং বেলা দুপুরের সময় পাহাড়ের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মাসী বোনঝি

নাকেশ্বরী যখন খেতুকে পাইল তখন খেতু প্রায় মর মর ইয়াছে। সে কিছুই জানিতে পারিল না। খেতুকে পাইয়া াকেশ্বরীর আর আনন্দ ধরে না। সে ভাবিল "অনেক দিন মন খাবার জোটে নি; ভাল করে রাঁধি। যাই মাসীকে নমন্তন্ন করে ডেকে আনি।" তাই পাছে পচিয়া যায় বলিয়া াকেশ্বরী খেতুকে না মারিয়া অজ্ঞান করিয়া মাসীকে ডাকিতে লিয়া গেল।

নাকেশ্বরীর মাসীর বাড়ী অনেক দূর; সাত সমুদ্র তের নদীর

পার সেই একঠেঙো মুল্লুকের ধারে। সেখানে যাইতে আসিতে অনেক দেরী হইল।

মাসী বুড়ো মানুষ, দাঁত নাই। খেতুর নরম মাংস দেখিয়া মাসীর আর আহ্লাদের সীমা নাই। বলিল "একঠেঙো মুল্লুকের মানুষের দড়িপানা শক্ত মাংস আর চিবাতে পারি না আজ দুঠেঙো মানুষের মাংস কেটে ভাজা কর্, আঙ্গুল দিয়ে চচ্চড়ি কর্ আর খানিকটুকু অম্বল করে রাখ্, দুদিন খাওয়া যাবে।"

মাসী বোনঝিতে এইরকম পরামর্শ হইতেছে এমন সময় বাইরে গোলমাল শোনা গেল, মানুষের গলার শব্দ, মশার গুন্‌গুন্, হাতীর ডাক তাহাদের কানে আসিল।

নাকেশ্বরী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "মাসি, সর্বনাশ হল; মুখের গ্রাস বুঝি কেড়ে নেয়! ছুঁড়ী বুঝি ওঝা ডেকে এনেছে।"

মাসী বলিল, "চল চল। দরজার ওপরে দুজনে পা ফাঁক করে দাঁড়াই।"

মশা, কঙ্কাবতী ও খর্বুর সুড়ঙ্গের ভিতর নীচে ঢুকিল; ঢুকিবার সময় নাকেশ্বরী ও তাহার মাসীর পায়ের দিক দিয়ে তাহাদের যাইতে হইল কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারিল না।

ভিতরে ঢুকিয়া তাহারা খেতুর কাছে গেল; দেখে খেতু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। খর্বুর বলিল, "কঙ্কাবতী, তোমার কোন ভয় নেই, তোমার স্বামী এখনও বেঁচে আছে। আমি এখনই এর বিহিত করছি।" এই বলিয়া খর্বুর মন্ত্র পড়িতে

লাগিল, খেতুর মাথায় ফুঁ দিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, খেতু যেমনকার তেমন পড়িয়া রহিল।

খর্বুর অবাক্ হইয়া বলিল "একি হল? আমার মন্ত্র তো বিফল হয় না। আজ একি হল?"

খর্বুর অনেক ভাবিল, পরে বলিল, "চলুন আমরা একবার বাইরে গিয়ে দেখি।" বাহিরে আসিবার সময় খর্বুর চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল। তখন দেখিতে পাইল ভূতিনীরা পা ফাঁক করিয়া দরজার উপর দাঁড়াইয়া আছে। তখন সে মনে মনে বলিল, "বটে, চালাকি তো কম নয়!"

খর্বুর এবার দরজার বাহির হইতেই মন্ত্র পড়িতে লাগিল। মন্ত্রের চোটে ভূতিনীরা পলাইয়া গেল। তখন খর্বুর আবার ঘরের ভিতর গিয়া ঝাড়ফুঁক শুরু করিল। ক্রমে মন্ত্রবলে নাকেশ্বরী আসিয়া খেতুর দেহে ভর করিল এবং খেতুর মুখ দিয়া অনেক কথা বলিতে লাগিল। প্রথমে বলিল সে খেতুকে ছাড়িবে না, খাইবে, সে পরের ধন চুরি করিয়াছে। শেষে খর্বুর যখন একটা কুমড়োতে মন্ত্র পড়িয়া কুমড়োটি কাটিয়া তাহাকে মারিবার ব্যবস্থা করিল, তখন নাকেশ্বরী কাকুতি মিনতি করিতে করিতে বলিল, "আমাকে মারবেন না, কুমড়োয় কোপ দেবেন না। আমি সত্যি কথা, সব কথা বলছি। আমায় মারলেও খেতু বাঁচবে না। এখনি মরে যাবে। এর আয়ু ফুরিয়েছে। আমি এর পরমায়ু নিয়ে কচুপাতে বেঁধে তালগাছের মাথায় রেখেছিলাম, মনে করেছিলাম মাসী এলে পরমায়ুটুকু চাটনি করে খাবো, তা পরমায়ু সমেত কচুপাতাটা

হাওয়ায় তালগাছ থেকে পড়ে গেছে। পিঁপড়েতে সেটুকু খেয়ে ফেলেছে। এখন আর আমি পরমায়ু কোথায় পাব যে রোগীকে এনে দেব?”

খর্বুর খড়ি পাতিয়া গুণিয়া দেখিল নাকেশ্বরী যাহা বলিতেছে সত্য। তখন সে নাকেশ্বরীকে বলিল, “সে পিঁপড়েগুলো কোথায় খুঁজে দেখ।”

তখন নাকেশ্বরী ও তাহার মাসী পিঁপড়েদের সন্ধানে বাহির হইল; কিন্তু কত খুঁজিল সন্ধান মিলিল না। শেষে কানা পিঁপড়ের সঙ্গে দেখা হইলে সে বলিল, “তালতলায় কচুপাতা হতে মানুষের মিষ্টি পরমায়ুটুকু চেটেচুটে খেয়ে হাত মুখ মুছে পিঁপড়েরা বাড়ী যাচ্ছিল এমন সময়ে সাহেবের পোষাক পরা এক ব্যাঙ তাদের খেয়ে ফেলেছে।”

নাকেশ্বরী আসিয়া খর্বুরকে খবরটা দিল। খর্বুর তখন আবার তাহাকে ব্যাঙের সন্ধান করিতে পাঠাইল। নাকেশ্বরী দেখিল ভাল বিপদ; কিন্তু উপায় নাই; তাহাকে যাইতেই হইল। কথা না শুনিলে খর্বুর কুমড়োটি বলি দেবে অমনি নাকেশ্বরীর গলাটি দুখানা হইয়া যাইবে।

নাকেশ্বরী অনেক খুঁজিল কিন্তু ব্যাঙের সন্ধান আর পাইল না। সে কোথায় গর্ত্তের ভিতর বসিয়া আছে, নাকেশ্বরী কেমন করিয়া তাহাকে পাইবে? নাকেশ্বরী আসিয়া খর্বুরকে বলিল, “আমায় মারুন আর কাটুন, ব্যাঙকে আমি পেলাম না।”

নাকেশ্বরীর কথায় খর্বুর অনেক ভাবিল; শেষে এক মুঠো সরিষা লইয়া মন্ত্র পড়িয়া ছাড়িয়া দিল; সরিষাগুলি ব্যাঙে

সন্ধানে ছুটিল। শেষে তাহারা ব্যাঙের খোঁজ পাইল; পাইয়া তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া যেখানে কঙ্কাবতী ও মশার সঙ্গে খর্বুর বসিয়াছিল সেখানে হাজির করিল। ব্যাঙকে দেখিতেই কঙ্কাবতী তাহাকে চিনিল, ব্যাঙ ও কঙ্কাবতীকে চিনিল। তাহারা তখন ব্যাঙকে সব কথা বলিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

খোক্কোশ

ব্যাঙ বলিল, "ঠিক কথা, সে পিঁপড়েদের তো আমি খেয়ে ফেলেছি। দেখি গলা থেকে বের করে দিতে পারি কিনা।" এই বলিয়া ব্যাঙ গলায় আঙ্গুল দিয়া অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুই হইল না; খর্বুরও তাহাকে বমি করাইবার অনেক ঔষধ দিল; তাহাতেও কিছু হইল না। তখন খর্বুরের একটা কথা মনে পড়িল; সে ভাবিল, "এইবার চাঁদকে বাগে পেয়েছি। চাঁদের মূল এ রোগের অব্যর্থ ওষুধ, খাওয়ালেই ব্যাঙের বমি হবে।" সে মশাকে বলিল, "মশায়, এর একটিমাত্র ওষুধ আছে, সে হল চাঁদের শিকড়; সেই শিকড়ের ছাল এক তোলা সাতটা মরিচ দিয়ে বেটে খাইয়ে দিলেই ব্যাঙের বমি হবে, আর কিছুতে হবে না।"

কথাটা শুনিয়া সকলেরই মন ভারি হইয়া গেল; চাঁদের শিকড় কেমন করিয়া পাওয়া যায়? অত দূরে যাওয়াই বা

যায় কেমন করিয়া ? মশা বলিল, "আমি অনেক দূর যেতে পারি বটে কিন্তু চাঁদ পর্যন্ত না।"

খর্বুর বলিল, "একটা খোক্কোশের বাচ্চা পেলে কাজটা হয়। খোক্কোশের বাচ্চার পিঠে চড়ে সহজেই চাঁদে পৌছান যাবে; কিন্তু খোক্কোশের বাচ্চা পাওয়া যাবে কোথায় ?"

ব্যাঙ বলিল, "এক জায়গায় খোক্কোশের বাচ্চা হয়েছে সেটা আমি জানি। কিন্তু খোক্কোশের বাচ্চা তোমরা ধরবে কেমন করে ? ধরতে গেলেই খোক্কোশ খেয়ে ফেলবে। তা ছাড়া না হয় বাচ্চাই পাওয়া গেল, আকাশে যাওয়া তো চারটিখানি কথা নয়; ওখানে ভয়ানক সেপাই আছে। সে আকাশ পাহারা দিয়ে বেড়ায়; কানে শোনে না বটে, কিন্তু সে বড় ভয়ানক লোক। তাই বলছি সেখানে যাবে কে ?"

কঙ্কাবতী বলিল, "তার জন্যে আমাদের কোন ভাবনা নেই; যদি খোক্কোশের বাচ্চা পাই তাহলে তার পিঠে চড়ে আমি আকাশে যাব। আমার আর কিসের ভয় !"

তখন খোক্কোশের বাচ্চা ধরাই স্থির হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

খোক্কোশের বাচ্চা

খোক্কোশের বাচ্চা ধরিয়া আকাশে উঠিয়া চাঁদের শিকড় আনিবার কথা নাকেশ্বরী ও তাহার মাসী বসিয়া শুনিল।

ভূতিনীমাসীর আকাশ চুণকাম

শুনিয়া তাহারা দুইজনে পরামর্শ করিতে লাগিল যে যদি এই কাজটা বন্ধ করা যায় তো খর্বুরও আমাদের দোষ দিতে পারিবে না, অথচ আমাদের শিকারও হাতছাড়া হইয়া যাইবে না।

নাকেশ্বরী বলিল, "মাসী, তুমি এক কাজ করো; তোমার ঝুড়িতে বসে তুমি আকাশে ওঠো; উঠে সমস্ত আকাশ একেবারে চুণকাম করে দাও; তাহলে ছুঁড়ি আর আকাশের ভেতর যেতে পথ খুঁজে পাবে না আর চাঁদও দেখতে পাবে না।"

মাসী বলিল, "ঠিক বলেছিস।" এই বলিয়া মাসী ঝুড়িতে বসিল; ঝুড়ি 'হু' 'হু' করিয়া আকাশে উঠিল আর নাকেশ্বরীর মাসী সমস্ত আকাশটা চুণকাম করিয়া দিল।

এদিকে মশারা খোক্কোশের বাচ্চা ধরিবার জন্য বাহির হইল। বাড়ীর বাহিরে আসিবার সময় মশা দেখিল একটা ঢাক পড়িয়া রহিয়াছে। সেটাকে সে হাতীর পিঠে তুলিয়া লইল। তখন হাতী যে বনে খোক্কোশের বাচ্চা হইয়াছে সেই বনের দিকে রওনা হইল।

একবার আকাশের দিকে চাহিয়া মশা বলিল, "কি হল? আজ দ্বিতীয়ার রাত; এখনও চাঁদ উঠিল না কেন? আর নক্ষত্রগুলোই বা গেল কোথায়, মেঘ তো করে নি; কিন্তু তাহলে আকাশ এত সাদাই বা হোল কেমন করে?"

সন্ধ্যার সময়ে সকলে খোক্কোশের গর্তের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধারী খোক্কোশ বাচ্চা চৌকি দিয়া গর্তে

বসিয়া আছে। কঙ্কাবতীর গন্ধ পাইতেই বলিল "হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ! তোরা কে রে এদিকে আসিস্?"

মশা চীৎকার করিয়া বলিল, "তুই কে?"

খোক্কোশ বলিল, "আমি আবার কে, খোক্কোশ।"

মশা বলিল, "আমরা আবার কে, খোক্কোশ।"

উত্তর শুনিয়া খোক্কোশের ভয় হইল। তবুও সাহস করিয়া বলিল, "একবার কাস দেখি, কেমন তোদের কাসি!"

মশা তখন ঢং ঢং করিয়া ঢাকটা বাজাইল।

সেই শব্দ শুনিয়া খোক্কোশের বিশ্বাস হইল যে এরা খোক্কোশ; কিন্তু আর একবার যাচাই করিয়া লইবার জন্য বলিল, "আচ্ছা, তোদের মাথার একগাছা চুল ফেলে দে তো দেখি।"

মশা তখন হাতীর কাছিটা ফেলিয়া দিল। খোক্কোশ দেখিয়া বলিল, "ওরে বাপ্"। কিন্তু তখনও তাহার সন্দেহ ঘোচে না; সে বলিল, "আচ্ছা, দে তো দেখি তোদের মাথার একটা উকুন, তবে বুঝব তোরা সত্যিই খোক্কোশ কি না।"

মশা তখন হাতীকে বলিল, "ভায়া, এইবার।" হাতী ধুপ করিয়া গর্তের ভিতর গিয়া পড়িল; পড়িয়াই শুঁড় দিয়া খোক্কোশের বাচ্চাকে জড়াইয়া ধরিল। এদিকে বাচ্চাটা চ্যাঁ চ্যাঁ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। খোক্কোশের ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গিয়াছে; সে ভাবিল, খোক্কোশের মাথার উকুনটাই এসে আমার বাচ্চাকে ধরল খোক্কোশরা এসে আমাকে না ধরে।" বাচ্চা ফেলিয়া খোক্কোশ পালাইল।

খোক্কোশের বাচ্চা

তখন মশা কঙ্কাবতীকে বলিল, "তুমি এখন এর পিঠে চড়ে আকাশে যাও, চাঁদের শেকড় নিয়ে এস। আমরা এখানে বসে থাকলাম ; তুমি এলে খোক্কোশের বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে দেব ; এটা এখনও নেহাত বাচ্চা, মায়ের দুধ খায় ; একে নিয়ে কি করব ? যা হোক্, তুমি সাবধানে যেও ; আকাশের সেপাইয়ের কথা যেন মনে থাকে।"

আকাশের দিকে চাহিয়া মশা আবার বলিল, "কিন্তু এতো ভারি আশ্চর্য ! এখনও কেন চাঁদ উঠল না ; একটা নক্ষত্রও দেখতে পাচ্ছি না। এদিকে আকাশ সাদা, এক টুকরো মেঘ নেই। কিছুই বুঝতে পারছি না। আকাশে উঠলে তুমি হয়তো বুঝতে পারবে।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্রদের বৌ

কঙ্কাবতী খোক্কোশের বাচ্চার পিঠে উঠিয়া বসিল ; বাচ্চাটা আকাশে উড়িল আর দেখিতে না দেখিতে আকাশের কাছে গিয়া পৌঁছিল।

আকাশের কাছে গিয়া কঙ্কাবতী দেখে সমস্ত আকাশটা একেবারে চুণকাম করা। সে ভাবিল "মহা মুস্কিল ! এখন ওপরে উঠি কেমন করে, কোথাও তো পথ দেখি না।"

হতাশ হইয়া কঙ্কাবতী আকাশের চারিধারে পথ খুঁজিতে

লাগিল। অনেকক্ষণ খুঁজিয়া হঠাৎ এক জায়গায় ছোট্ট একটি ফুটো দেখিতে পাইল। সেই ফুটো দিয়া নক্ষত্রদের বৌ উঁকি মারিতেছিল। কঙ্কাবতীকে দেখিয়া ভয়ে লুকাইল।

কঙ্কাবতী বলিল, "ওগো নক্ষত্রদের বৌ! তোমার কোন ভয় নেই! আমি মেয়ে মানুষ; আমাকে দেখে আবার লজ্জা করো না।"

তখন নক্ষত্রদের বৌ মুখটি বাড়াইল; বলিল, "তুমি কে গা বাছা; অনেকক্ষণ থেকে দেখছি কি খুঁজছ? মনে করলাম জিজ্ঞেস করি। কিন্তু আমি বৌমানুষ, হঠাৎ কি কারও সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

কঙ্কাবতী বলিল, "বাছা, আমি আকাশের ভেতরে যাবার পথ খুঁজছি। আমার বড় দরকার; নইলে আমার স্বামী বাঁচেন না।"

নক্ষত্রদের বৌ বলিল, "পথ আর খুঁজে পাবে কেমন করে বলো। এই সন্ধ্যেবেলায় এক ভূতিনী বুড়ি এসে সমস্ত আকাশটা চুণকাম করে দিয়ে গেছে। তা আমি তোমায় চুপি চুপি খিড়কী দোরটা খুলে দিই। তুমি এসো।"

এই কথা বলিয়া নক্ষত্রদের বৌ আকাশের খিড়কী দোরটি খুলিয়া দিল। সেই পথে কঙ্কাবতী আকাশের উপরে উঠিল। আকাশের ভিতর দিয়া কঙ্কাবতী খোক্কোশের বাচ্চাটিকে একটা মেঘের ডালে বাঁধিয়া দিয়া চাঁদের খোঁজে চলিল। আকাশের মাঠে চারিদিকে নক্ষত্র ফুটিয়া আছে; দূরে চাঁদ চাকার ম বসিয়া আছে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

চাঁদের শিকড়

এদিকে চাঁদ খবর পাইয়াছে কে একটি মানুষের মেয়ে খন্তা কুড়ুল লইয়া তাহার মূল শিকড় কাটিয়া লইবার জন্য আসিতেছে। খবরটা পাইয়া চাঁদের বড় ভয় হইল। সে আকাশের সিপাহীকে ডাকিয়া পাঠাইল। সিপাহী বীরপুরুষ

চাঁদ ও দুর্দান্ত সিপাহী

বটে কিন্তু কাণে একটু কম শোনে; চীৎকার করিয়া না বলিলে শুনিতে পায় না।

সিপাহী আসিল। চাঁদ চীৎকার করিয়া তাহাকে সব কথা

বলিলেন; বলিলেন, “আমার মূল শিকড় কাটতে মানুষ এসেছে।”

সিপাহী ভাবিল চাঁদ তাহাকে কালা মনে করিয়া এত হাঁ করিয়া কথা বলিতেছে। তাহার বড় রাগ হইল। বলিল, “নাও, আর অত হাঁ করতে হবে না; শেষকালে চিড় খেয়ে ফেটে চুটকরা হয়ে যাবে।”

চাঁদ একটু কম হাঁ করিয়া আবার বলিল, “আমার মূল শিকড় কেটে নিতে মানুষ এসেছে।”

এবার সিপাহী বলিল, “আর অত চুপি চুপি কথা কইতে হবে না। কোথাও ডাকাতি করবে নাকি? করলে কিন্তু আমায় ভাগ দিতে হবে।”

চাঁদ দেখে মহাবিপদ। সে বলিল, “না, না, ডাকাতির কথা বলি নি। আমি বলছি আমার মূল শিকড় কাটতে মানুষ এসেছে।”

এতক্ষণে সিপাহী কথাটা শুনিতে পাইল। শুনিয়া বলিল, “বেশ তো, কেটে নিয়ে যাবে, নিয়ে যাক্; তাতে আর কি?”

চাঁদ বলিল, “বা রে তুমি আকাশের চৌকিদার! আমাদের দেখবে না?”

সিপাহী বলিল, “তোমায় বাঁচাতে গিয়ে যদি আমায় নিয়ে টানাটানি করে। বাবা, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।” এই বলিয়া সিপাহী পালাইল।

চাঁদ ভাবিল “কি করা যাবে? যা কপালে আছে তাই হবে; না হয় দেখাই যাক্।”

কঙ্কাবতী কাছে আসিতেই চাঁদ করিল কি, চক্ষু বুজিয়া নিশ্বাস বন্ধ করিয়া মড়ার মত পড়িয়া রহিল ; যদি মরা দেখিয়া কঙ্কাবতী কিছু না করে। কঙ্কাবতী চাঁদের এই অবস্থা দেখিয়া ভাবিল "আহা, শিকড় কেটে নেব এই ভয়ে বুঝি এমন সুন্দর চাঁদ মারা গেল। চাঁদ গেলে আর তো জ্যোৎস্না হবে না, চির-কাল অমাবস্যা থাকবে। কি হবে ?"

কঙ্কাবতী আর একটু ভাল করিয়া দেখিতে গিয়াই টের পাইল যে চাঁদ মরে নাই। ভাবিল "মূর্ছা গিয়াছে ভালই হইয়াছে। এখন শিকড় কাটিয়া লইলে লাগিবে না। আমার তো বেশী শিকড় চাই না ; এক তোলা হইলেই চলিবে।" এই ভাবিয়া ছুটিয়া গিয়া শিকড় চাঁচিতে লাগিল। চাঁদ বলিয়া উঠিল, "উঃ লাগে যে !"

কঙ্কাবতী বলিল, "ভয় নেই, এই হয়ে গেল।"

চাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "আবার গজাবে তো ?"

কঙ্কাবতী বলিল, "নিশ্চয়।"

চাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "যদি ঘা হয় ?"

কঙ্কাবতী বলিল, "একটু ঘি গরম করে দিও।"

চাঁদ বলিল, "তুমি বুঝি ডাক্তার ?" কঙ্কাবতী বলিল, "না, ডাক্তার নই, তবে দুএকটা ওষুধ জানি।" চাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, "দাঁতের ব্যথার ওষুধ জানো ? আমার বড় দাঁতের ব্যথা।"

কঙ্কাবতী বলিল, "তোমার দাঁতের ব্যথা আর সারবে না ; বয়েস হয়েছে তো ? আর তো খোকা নও। এখন দাঁতগুলো একে একে পড়ে যাবে। তা তোমার যদি সখ হয়, তাহলে

আমার সঙ্গে চলো ; তোমার দাঁতগুলো তুলিয়ে দাঁত বাঁধিয়ে দেব।"

চাঁদ দেখে মহাবিপদ। সে বলিল, "না, না, থাক্। তুমি এখন যাও। দেরী হলে লোকে ভাববে। আর আমি এত ভারী, তুমি আমায় নিয়ে যেতে পারবে কেন?"

কঙ্কাবতী বলিল, "কি বললে? তুমি ভারী ; আমি তোমায় নিয়ে যেতে পারব না ; বটে? তোমার চেয়ে বড় বড় বগি থালা আমি কত মেজেছি। দেখ তোমায় নিয়ে যেতে পারি কি না।"

এই বলিয়া কঙ্কাবতী আঁচল পাতিল ; চাঁদ ধরে আর কি? তখন চাঁদের বৌ আর ছেলেমেয়েগুলি আসিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল ; চাঁদের ছোট মেয়েটি কাঁদে আর থাকিয়া থাকিয়া কঙ্কাবতীকে চিমটি কাটে।

কঙ্কাবতী তখন চাঁদনীকে বলিল, "ওগো বাছা, তুমি তোমার এ মেয়েকে সামলাও। দরকার নেই আমার তোমার স্বামীকে নিয়ে যাবার। তোমার স্বামী বলছিল তার দাঁত নড়ে ; তাই ভেবেছিলাম ওকে নিয়ে গিয়ে ওর দাঁত বাঁধিয়ে দেব ওরই ভাল হ'ত। তা থাক্, তোমাদের যখন এত আপত্তি ওকে নাই নিয়ে গেলাম।"

চাঁদনী বলিল, "হ্যাঁ তুমি এখন ঘরে ফিরে যাও, তোমার তো কাজ হয়েছে।"

কঙ্কাবতী বলিল, "আমার ভারী ইচ্ছা হচ্ছে কয়েকটা নক্ষত্র, তুলে নিয়ে যাই। এখানে তো কত রয়েছে। কিন্তু অত সব বয়ে নিয়ে যাব কেমন করে? একটা মুটে চাই।"

চাঁদনী বলিল, "মুটে কি আর পাবে? সবাই তোমার ভয়ে ঘরে খিল দিয়েছে।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

তালপাতার সেপাই

দূরে একটা লোক মেঘের পাশ হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছিল। কঙ্কাবতী তাহাকে ডাকিল; ডাকিতেই সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পালাইল। কঙ্কাবতীও তাহার পিছনে ছুটিল। ছুটিতে ছুটিতে লোকটা এক ঢিপি মেঘে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল। তখন কঙ্কাবতী ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ধরিয়া দেখে লোকটার শরীর তাল-পাতা দিয়া তৈয়ারী, তালপাতার হাত, পা, নাক, সবই তালপাতার।

কঙ্কাবতী অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

সে উত্তর করিল, "আমি আকাশের দুর্দান্ত সেপাই!"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "তা তোমার শরীর তালপাতার কেন?"

লোকটা রাগ করিয়া উত্তর দিল, "তালপাতার হবে না তো কিসের হবে? ইট, পাথর চূণ সুরকি দিয়ে কি রেক্তার গাঁথুনি করে তৈরী হবে? তুমি এত জানো, তালপাতার সেপাইয়ের নাম জানো না? আমার মত বীর পৃথিবীতে আর নেই জানো না? যাই হোক্, এখন আমায় ছেড়ে দাও, আমি বাড়ী

যাই ; তুমিও বাড়ী যাও। তোমার কাজ তো হয়েছে ; শেকড় তো পেয়েছ।"

কঙ্কাবতী বলিল, "দেখ দুর্দান্ত সেপাই, তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। না হলে তোমায় আমি ছাড়ব না। এক বোঝা নক্ষত্র তোমায় বয়ে নিয়ে আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

সিপাহী আর করে কি ? কাজেই রাজী হইল। কঙ্কাবতীর আঁচলে আর ক'টি নক্ষত্র ধরিবে ? তাই কঙ্কাবতী ভাবিল, "নক্ষত্রগুলো কিসে বেঁধে নিয়ে যাই ?" সিপাহী বলিল, "তার আর ভাবনা কি ? চল, আকাশ-বুড়ির কাছে যাই ; সে চরকা কেটে কত কাপড় করেছে ; তার কাছ থেকে না হয় একটা গামছা চেয়ে নেব।"

আকাশ-বুড়ি বসিয়া চরকা কাটিতেছিল। গামছা চাওয়াতে একটা গামছা ফেলিয়া দিল। তখন কঙ্কাবতী গামছা ভরিয়া ছোট বড়, ফুটন্ত আধ-ফুটন্ত, কুড়ি নানা রকমের নানা রঙের নক্ষত্র তুলিল। সেগুলি বাঁধিয়া সিপাহীর মাথায় দিল।

সিপাহী ভাবিল "এতকাল চাকরী করলাম, কখনও মুটে-গিরি করতে হয় নি ; আজ তাও হল।"

মোট মাথায় করিয়া সিপাহী আগে আগে চলিল, কঙ্কাবতী পিছনে পিছনে চলিল। খোক্কোশের বাচ্চার কাছে পৌঁছিয়া কঙ্কাবতী বলিল, "এখন তুমি যেতে পারো ; আমার আর দরকার নেই।" বলিতে না বলিতেই সিপাহী মোট রাখিয়া এমন ছুট দিল যে নিমেষের মধ্যে তাহার টিকিও দেখা গেল না।

কঙ্কাবতী মোটটা লইয়া খোক্কোশের বাচ্চার পিঠে চড়িল ; খোক্কোশের বাচ্চা আবার পৃথিবীতে নামিতে লাগিল।

যেখানে মশা, হাতী ও খর্বুর অপেক্ষা করিতেছিল কঙ্কাবতী সেখানে আসিয়া পৌঁছাইল। খোক্কোশের বাচ্চাটিকে তখন ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বাকী সকলে পাহাড়ের ভিতর বাড়ীতে ফিরিয়া গেল। সেখানে গিয়া খর্বুর ব্যাঙকে শিকড় বাটিয়া খাওয়াইয়া দিল ; খাওয়াইতেই ব্যাঙ হুড় হুড় করিয়া বমি করিতে আরম্ভ করিল। বমি করিতে করিতে সেই পিঁপড়েগুলি বাহির হইল। খর্বুর তখন একটা সন্না দিয়া পিঁপড়ের পেট হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া পরমায়ুর টুকরোগুলি বাহির করিয়া বলিলেন, "কৈ বেশী তো বার হোলো না? এতে ফল হবে না।"

খর্বুর হতাশ হইয়া পড়িল, মশা বিষণ্ণ হইল, ব্যাঙের চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কঙ্কাবতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। খুশী হইল শুধু নাকেশ্বরী ও তার মাসী ; তাহারা অদৃশ্য হইয়া সবকিছু দেখিতেছিল, শুনিতেছিল।

যাই হোক্ পরমায়ুটুকু লইয়া খর্বুর খেতুর নাকে দিল ; দিতেই খেতু উঠিয়া বসিল। উঠিয়া বলিল, "উঃ অনেক বেলা হয়ে গেছে। এতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, কঙ্কাবতী তুমি আমায় জাগিয়ে দিতে পারো নি?"

কঙ্কাবতী বলিল, "সাধ্য থাকলে কি আর দিতাম না?"

খেতু তখন চারিদিক চাহিয়া দেখিল ; দেখিল কঙ্কাবতী কাঁদিতেছে ; খর্বুর, মশা ও ব্যাঙ বিষণ্ণবদনে বসিয়া আছে

খেতু জিজ্ঞাসা করিল, "কঙ্কাবতী, তুমি কাঁদছ কেন? এরাই বা কারা?"

কঙ্কাবতী কোন উত্তর দিল না।

তখন খেতু বলিল, "আমার সব কথা এখন মনে পড়ছে। আমার মাথায় শিকড় ছিল না তাই নাকেশ্বরী আমায় খেয়েছিল। তুমি বুঝি এঁদের ডেকে এনে আমায় ভাল করেছ? তাহলে আর কাঁদছ কেন? আমি তো ভাল হয়ে গেছি। কেবল মাথাটা একটু টিপ্ টিপ্ করছে; দাও না মাথাটা একটু টিপে। দাও, দাও ব্যথা বাড়ছে। অসহ্য যন্ত্রণা! প্রাণ বুঝি গেল। ওগো তোমরা আমার কঙ্কাবতীকে দেখো।" বলিতে বলিতেই খেতুর প্রাণ শেষ হইল।

খেতু মারা গেল।

ঘাড় হেঁট করিয়া সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কাহারও মুখে কথা নাই। সকলের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। কেবল কঙ্কাবতী স্থির হইয়া বসিয়া আছে।

অনেকক্ষণ পরে খর্বুর বলিল, "এবার সব ফুরোলো। আমাদের এত চেষ্টা সব বৃথা গেল। তালগাছ থেকে পড়বার সময় পরমায়ুর বেশীর ভাগ বাতাসে উড়ে গেছে, সামান্য একটু পিঁপড়েগুলো খেয়েছিল। তাতে আর মানুষ কতক্ষণ বাঁচে।"

এই বলিয়া খর্বুর কাঁদিতে লাগিল; মশা কাঁদিল, ব্যাঙ রুমাল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল, বাহিরে হাতী ঘন ঘন শুঁড় দিয়া ধূলা উড়াইতে লাগিল। কেবল কঙ্কাবতী চুপ, তাহার চোখে এক ফোঁটা জল নাই।

অবশেষে মশা বলিল, "ওঠো মা ; এখন আমরা তোমার স্বামীর সৎকার করি। তারপর বাড়ী যাব ; রক্তবতীকে দেখলে হয়তো তোমার মনে একটু শান্তি পাবে।" মশা, খর্বুর ও ব্যাঙ কঙ্কাবতীকে বুঝাইতে লাগিল।

কঙ্কাবতী বলিল, "আপনারা আমার অনেক উপকার করেছেন, অনেক খেটেছেন। সে খাটুনিতে যে ফল হল না সে কেবল আমার অদৃষ্ট। ভগবান আপনাদের ভাল করবেন। আপনারা এতখানি করেছেন আর একটু করুন। আমি সতী হব, তার ব্যবস্থা আপনারা করে দিন।"

শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল, এতটুকু মেয়ে! স্বামীর সঙ্গে চিতায় পুড়িয়া মরিবে? কেবল নাকেশ্বরী ও তাহার মাসী খুশী হইয়া উঠিল ; এর জন্য আমাদের খাবার হাতছাড়া হইয়াছে, এখন এটা মরুক! কঙ্কাবতীর কথা শুনিয়া মশা, ব্যাঙ প্রভৃতি সকলে মিলিয়া তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কঙ্কাবতী অটল, সে স্বামীর চিতায় প্রাণত্যাগ করিবে।

কঙ্কাবতীর প্রতিজ্ঞা দেখিয়া অবশেষে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সকলকে মত দিতে হইল। কঙ্কাবতী বলিল কুসুমঘাটিতে যে ঘাটে তাহার শাশুড়িকে পোড়ানো হইয়াছিল সেই ঘাটে চিতা সাজানো হইবে, সেইখানেই সে সহমরণে যাইবে।

কঙ্কাবতী সতী হইবে চারিদিকে সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গেল ; সকলে আসিয়া কুসুমঘাটির ঘাটে জড় হইল ; হাতীর পিঠে খেতুর দেহ লইয়া কঙ্কাবতী আসিল ; মশার বাড়ী হইতে তিন মশানী ও রক্তবতী আসিল। রক্তবতী আসিয়া কঙ্কাবতীর

গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। কঙ্কাবতী তাহার হাতে নক্ষত্রগুলি দিয়া তিন ছড়া মালা গাঁথিতে বলিল; এক ছড়া রক্তবতী লইবে আর দুই ছড়া কঙ্কাবতীর।

চিতা সাজানো হইল। তখন মেয়েরা আসিয়া কঙ্কাবতীকে সাজাইয়া দিল; তাহাকে স্নান করাইয়া রাঙা চেলির কাপড় পরাইয়া দিল, রাঙা সূতা দিয়া হাতে আলতা বাঁধিয়া দিল; কপাল জুড়িয়া সিঁদুর ঢালিয়া দিল।

পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র পড়াইল। চিতা প্রদক্ষিণ করাইল, তাহার পর কঙ্কাবতী রক্তবতীর নিকট হইতে নক্ষত্রের মালা দুই ছড়া লইয়া চিতায় উঠিয়া এক ছড়া খেতুর গলায় পরাইয়া দিল, আর এক ছড়া নিজে পরিল। তাহার পর স্বামীর বাঁয়ে গিয়া শুইল।

তখন সকলে চিতায় আগুন দিল। চারিদিকে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল; চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

কঙ্কাবতী ঘুমাইয়া পড়িল, অঘোর ঘুম, বড় সুখের ঘুম।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

শেষ

কঙ্কাবতী ঘুমাইতেছে, বড় সুখের ঘুম। বৈদ্য বলিলেন "আর ভয় নেই, বিকার কেটে গেছে; নাড়ী পরিষ্কার হয়েছে এখন একে ঘুমাতে দাও; যেন ঘুম না ভাঙে।"

বৈদ্য চলিয়া গেলেন। রোগী ঘুমাইতে লাগিল, তাহার শিয়রে মা পাখা হাতে বসিয়া রহিলেন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বাইশ দিন তিনি এমনই করিয়া কঙ্কাবতীর মাথার কাছে বসিয়া আছেন। এই বাইশ দিন যমে মানুষে যুদ্ধ হইয়াছে, শেষে যম হার মানিয়াছে। মায়ের সেবা মায়ের যত্ন জয়ী হইয়াছে। বিকারের ঘোরে কঙ্কাবতী কেবলই খেতুর কথা বলিয়াছে। তিনি শুনিয়াছেন আর চোখের জলে তাঁর বুক ভাসিয়াছে।

ভোর হইল; কঙ্কাবতীর ঘুম ভাঙিল। সে অবাক্ হইয়া চারিদিক্ দেখিতে লাগিল। দিদি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় চিনতে পার?"

কঙ্কাবতী ঘাড় নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিল, "পারি, তুমি বড় দিদি।"

তনু রায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কঙ্কাবতী, আজ কেমন আছ মা?"

কঙ্কাবতী বলিল, "ভাল আছি, বাবা।"

তিনি একটু কাছে বসিলেন; স্নেহভরে মেয়ের গায়ে মাথায় হাত বুলাইলেন। তাহার পর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কঙ্কাবতী ভাবিল, "মা বাবা দিদি সবাই দেখছি আমার সঙ্গে স্বর্গে এসেছেন, কিন্তু যাঁর সঙ্গে সহমরণে গেলাম তিনি কোথায়?"

শেষে কঙ্কাবতী মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তিনি কোথায়?"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কে?"

কঙ্কাবতী বলিল, "সেই যিনি বাঘ হয়েছিলেন?"

মা বলিলেন, "তবে কি বিকার কাটে নি, এখনও প্রলাপ বকছে?"

কথাটা শুনিয়া কঙ্কাবতীর মনে খটকা বাধিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি আমার খুব অসুখ করেছিল?"

মা বলিলেন, "হ্যাঁ, বাছা, আজ বাইশ দিন তুমি বিছানায় পড়ে আছ। তোমার জ্ঞান ছিল না। তুমি যে বাঁচবে সে আশা ছিল না।"

কঙ্কাবতী বলিল, "মা আমি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি; সে স্বপ্ন আমার মনে গাঁথা আছে, যেন সত্যিই ঘটেছে। আচ্ছা মা, জনার্দন চৌধুরীর কি বৌ মরে গেছে?"

মা বলিলেন, "হ্যাঁ বাছা, সেই নিয়েই তো আমাদের যত বিপদ।"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, গাঁয়ে কি দলাদলি হয়েছিল?"

মা বলিলেন, "সে কথাও ঠিক। সেই নিয়ে লোকে খেতুর মাকে কত অপমান করল।"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি এখন কোথায়?"

মা বলিলেন, "তিনি রোজ আসেন, তোমার সেবা করেন, এখন তুমি ভাল হয়ে ওঠ, তাঁর হাতে তোমায় দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

কঙ্কাবতী বুঝিল, তবে খেতুর মা মরেন নাই। সে কথাটা স্বপ্ন। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, এই দলাদলির পর আমার জ্বর হয়, না, মা?"

মা বলিলেন, "হ্যাঁ, তার পরেই তুমি জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়ো। সে আজ বাইশ দিন।"

কঙ্কাবতী বলিল, "তারপর আমি নদীর ঘাটে গিয়ে একটা নৌকায় চড়ি, না, মা?"

মা বলিলেন, "বালাই, তুমি নৌকায় চড়তে যাবে কেন? সেই অবধিই তো তুমি বিছানায় পড়ে।"

কঙ্কাবতী বলিল, "মা, কত কি যে আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি সে আর তোমায় কি বলব? সেসব কথা মনে হলে হাসিও পায় কান্নাও পায়। সেসব কথা থাক্, এখন বলো সে দলাদলির কি হল?"

মা উত্তর দিলেন, "সে দলাদলি সব মিটে গেছে। ক'দিন আগে জনার্দন চৌধুরীর এক নাতি হঠাৎ মারা গেল, নাতিটিকে চৌধুরী বড় ভালবাসতেন। তখন ভগবান তাঁকে সুমতি দিলেন। তিনি রামহরিকে কলকাতা থেকে আনালেন; তার সঙ্গে অনেক পরামর্শ করলেন। তারপর রামহরি নিরঞ্জনকে ডেকে আনলেন। তখন রামহরি, নিরঞ্জন, আমাদের কর্তা আর খেতু সকলে মিলে জনার্দন চৌধুরীর ওখানে গেলেন। চৌধুরী বললেন, "আমি পাগল হয়েছিলাম তাই বিয়ের কথা তুলেছিলাম। তাই নিরঞ্জন আর খেতুর ওপর এসব অত্যাচার করেছিলাম। ওসব কথা এখন যাক্। তোমরা

কিছু মনে কোরো না ; এখন যাতে এঁর মেয়েটা বাঁচে তাই করো।” এই বলে জনার্দন চৌধুরী নিরঞ্জনকে অনেক বুঝিয়ে তাঁর জমি ফিরিয়ে দিলেন। খেতুকে অনেক আশীর্বাদ করলেন। তিনি আর সে মানুষ নেই। নিরঞ্জনও তাঁর ভিটেতে ফিরে এসেছেন। বিপদে পড়লে লোকের এমনি সুমতি হয়। আমাদের কর্তারও সুমতি হয়েছে, তোমার দাদারও মন ফিরেছে। এখন তুমি ভাল হয়ে ওঠো, তারপর ঠিক হয়েছে তোমার সঙ্গে খেতুর বিয়ে দেব। এখন তুমি আর কথা বোলো না।”

কঙ্কাবতী চক্ষু বুজিল ; তাহার মন আজ খুশীতে ভরিয়া উঠিয়াছে।

কঙ্কাবতী আস্তে আস্তে ভাল হইয়া উঠিল। বিছানায় শুইয়া শুইয়া সে তাহার সখীদের কাছে তাহার স্বপ্নের গল্প করিয়াছে; সে কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে।

কঙ্কাবতী একেবারে ভাল হইয়া উঠিলে তাহার সঙ্গে খেতুর বিবাহ হইয়া গেল। সকলেই খুশী হইয়া বিবাহে যোগ দিল। খুব মজা হইল, তনু রায় ঘটা করিয়া সাত গাঁয়ের লোক খাওয়াইলেন। সকলে আসিয়া খেতু আর কঙ্কাবতীকে আশীর্বাদ করিল। তাহার পর ? তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে লাগিল। তাহার পর কি হইল ? তাহার পর, “আমার কথাটি ফুরোলো ; নটে গাছটি মুড়োলো।”